Registered

মূল্য ঃ পাঁচ টাকা

এক

তোমার অখণ্ড মানবতাবোধ এবং মানব সংবেদন নিয়ে তুমি নতুন জগৎ গড়ে তোলার কাজে অংশগ্রহণ কর! জীবন শিল্পী তুমি! তোমার মানবতাবোধ এবং মানব সংবেদনের সততাই নতুন জগৎ সৃষ্টির বিপ্লবের সঙ্গে একাত্ম করবে।

—কম. ত্রিদিব চৌধুরী

গণবার্তা

সম্পাদকীয়	১
পশ্চিমবঙ্গ দুর্নীতি ও অরাজকতার চরমসীমায়	১
দেশে-বিদেশে	২
প্রেলেতারিয়ান ডিক্টেটরশিপ	৩
আর ওয়াই এফ ও পি এস ইউ-এর আহ্বানে রাজভবন অভিযান	৪
পুঁজিবাদ প্রায় মৃত....সমাজতন্ত্র	৫
পঞ্চায়েত নির্বাচনে লড়াই	৬
২২তম জাতীয় সম্মেলনের শিক্ষা	৭
পেরুতে রেজিম চেঞ্জ	৮

70th Year 21st Issue ★ Kolkata ★ Weekly GANAVARTA ★ Saturday 24th December 2022

সম্পাদকীয়

করোনার ভীতি নির্মাণের অপচেষ্টা

জাতীয় কংগ্রেসের নয়াউদারবাদী অর্থনৈতিক নীতি এবং বুর্জোয়া শ্রেণিচরিত্র সম্বন্ধে বামপন্থীরা সবাই মোটামুটি ঐকমত্য ঘোষণা করে এসেছেন। তাছাড়া পাশাপাশি কিভাবে সংকটগ্রস্ত আগ্রাসী পুঁজিবাদ ভারত সহ পৃথিবীর উন্নত পুঁজিবাদী দেশ সহ প্রায় সর্বত্রই শাসনক্ষমতায় উদারনৈতিক বুর্জোয়া দলগুলিকে প্রতিস্থাপিত করে স্বেচ্ছাচারী রাজনৈতিক দলগুলিকে রাষ্ট্রক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত করার জন্য সচেষ্ট, সেই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ জনসাধারণের সামনে তুলে ধরেছে।

অতীতে যেভাবে করোনা অতিমারিকে দেশবাসীর গণতান্ত্রিক অধিকার লুণ্ঠনের লক্ষ্যে ব্যবহার করা হয়েছিল, সেভাবেই জাতীয় কংগ্রেসের 'ভারত জোড়ো' যাত্রার উপর বিধিনিষেধ চাপিয়ে দিয়ে দেশের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার সাংবিধানিক ঐতিহ্যের বিরুদ্ধে অবিশ্বাস জাগিয়ে তোলা হচ্ছে। ফলে জনস্বাস্থ্য সম্বন্ধে একটি চূড়ান্ত ভ্রান্ত, বিকৃত এবং অবক্ষয়িত ধারণা সৃষ্টি করা হচ্ছে। সেদিনও যারা গুজরাটের ভোটের প্রচারে বুক বাজিয়ে মাস্ক ছাড়া সহস্র মানুষের কাছে চিনের সাপেক্ষে মোদির নেতৃত্বে ভারতের করোনার বিরুদ্ধে লড়াই-এর কথা বলেছিলেন, আজ একমাস যেতে না যেতেই তারাই 'ভারত জোড়ো' যাত্রার উপর করোনা নিয়ন্ত্রণ বিধি চাপিয়ে দিচ্ছেন। স্পষ্টতই রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত নির্দেশ।

দেশি-বিদেশি কর্পোরেট সংস্থাগুলি সেই ভয়ঙ্কর মানবিকতাবাদ বিরোধী মতবাদের পক্ষে জনগণের সম্মতি আদায়ের জন্য হীনতম কৌশল গ্রহণ করতে মূলধারার প্রচারমাধ্যমগুলির উপর একাধিপত্য স্থাপনের জন্য উঠেপড়ে লেগেছে।

একথা অনস্বীকার্য সংসদীয় নির্বাচনগুলিতে এই ফ্যাসিবাদী প্রক্রিয়া যথেষ্ট ফলপ্রসূ হচ্ছে। এখনও পর্যন্ত হাজার হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে জনসম্মতি নির্মাণ, সেই নেতিবাচক মনোভাবের উপর নির্বাচনে জয়লাভের পর বিরোধী কণ্ঠরোধ, প্রয়োজনে নির্বাচনে ভালো ফল না করলেও দুর্নীতির আশ্রয়ে রাজ্যে রাজ্যে ক্ষমতা দখল—আবার ক্ষমতার জোরে জনসম্মতি নির্মাণ ও বিরোধী দমন। এই দুষ্টচক্রের মাধ্যমে ফ্যাসিবাদকে দীর্ঘস্থায়ী করার নীতি গ্রহণ করেছে।

দুঃখের কথা, আমাদের দেশের নাগরিকদের মানসিকতায় এখনও সেই ইতিবাচক মানসিকতা দানা বাঁধে নি। যেমন একটি সাম্প্রতিক সমীক্ষা বলছে যে দেশের ৫৪ শতাংশ নাগরিক এখনও সংঘপরিবার প্রচারিত তত্ত্ব 'লাভ জেহাদে' বিশ্বাসী। অথচ প্রগতিশীল নাগরিক সমাজ এখনও পর্যন্ত দেশের সংবিধানের গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের চলচ্চিত্র ছদ্ম অথচ উগ্র দেশপ্রেমের কাহিনীর মাধ্যমে এবং স্বাধীনতা প্রাপ্তির ৭৫ বর্ষে স্বাধীনতা সংগ্রামে সংঘ পরিবারের দুরপনেয় বিশ্বাসঘাতকতার ভূমিকা গোপন করা হচ্ছে। তার বিরুদ্ধে বুদ্ধিজীবী সমাজের প্রতিবাদী অবস্থান কতটুকু? কতটুকুই বা নোটবাতিল এবং জি এস টি'র মতো সর্বনাশা অর্থনৈতিক প্রকল্পের বিরুদ্ধে?

এন ডি টিভির সঞ্চালকেরা এ বিষয়ে সোচ্চার হয়েছিলেন, একথা অনস্বীকার্য। কিভাবে মোদি-সরকার তাদের স্যাঙাত পুঁজিপতি আদানি গোষ্ঠীর সাহায্যে তাদের কণ্ঠরোধ করছে, এর বিরুদ্ধে সমস্ত মিডিয়া এখনও কেন নীরব। সি এ এ-এন আর সি বিরোধী সংগ্রাম বা ঐতিহাসিক কৃষক সংগ্রামের ভূমিকা যেভাবে মূলধারার প্রচারমাধ্যম সংঘ পরিবারের চোখ রাঙানিতে ব্ল্যাক আউট করেছিল বা দেশদ্রোহী আন্দোলন বলে চিহ্নিত করেছিল তার বিরুদ্ধে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত, সাংবাদিক সম্পাদক মহল প্রকৃত বিষয়গুলি তুলে না ধরে বিজেপি'র শাসানির কাছে আত্মসমর্পণ করেছে, উপঢৌকন লাভ করেছে।

একথাও ঠিক ইতিহাসের বিরুদ্ধে, প্রাতিষ্ঠানিকতার বিরুদ্ধে বিকল্প সৃষ্টিকারী ফ্যাসিবাদী শক্তি যতই 'এরা-ওরা'র হাজার দেওয়াল তুলুক না কেন? হরিয়ানায় গ্রেপ্তার এবং চরম অত্যাচারিত মজদুর অধিকার সংগঠনের নেতা শিবকুমার এবং তাঁর সহকর্মীদের অত্যাচারের তদন্তে দায়িত্বকারী বিচারক, হরিয়ানা সরকার এবং পুলিশের নৃশংসতা এবং মিথ্যা তথ্যর বিরুদ্ধে রায় দিয়েছেন। ভীমা কোরাগাঁও মামলার মিথ্যা অভিযোগগুলি একে একে প্রমাণিত হচ্ছে।

এভাবেই একটু একটু করে বাস্তব অবস্থা ও জনগণের চরম দুর্দশার বিরুদ্ধে ফ্যাসিবাদী শক্তির বিকল্প 'অপর' ও জনমানসে স্থান করে নিচ্ছে।

কম. ত্রিদিব চৌধুরী লাল সেলাম

তিনি ছিলেন দীর্ঘকাল ভারতের বুকে বৈজ্ঞানিক সমাজবাদ বা বিপ্লবী সমাজবাদের তত্ত্ব নির্মাণে এক অনন্য চিন্তক। মার্কসবাদ-লেনিনবাদের প্রায়োগিক ব্যাখ্যা ও রণনীতি স্থির করে ভারতের আর্থ সামাজিক ক্ষেত্রে তার বিজ্ঞানসম্মত বাস্তবায়নের পথ নির্ধারণে কমরেড ত্রিদিব চৌধুরীর অংশগ্রহণ কোনো অতীতের প্রসঙ্গ নয়। এখনও, এই শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে, আগ্রাসী পুঁজিবাদের দুর্মর আক্রমণগুলি প্রতিহত করতে তাঁর বাস্তবসম্মত বিশ্লেষণগুলি বারবার ফিরে দেখতে হয়। তিনি তাঁর প্রয়াণের তিন দশক পরেও অতীব প্রাসঙ্গিক ও প্রায় সমসাময়িক। গণবার্তার সম্পাদকমণ্ডলী তাঁর অমলিন স্মৃতির প্রতি আনত চিত্তে শ্রদ্ধা জানায়।

মার্কসবাদী চিন্তানায়ক
কম. ত্রিদিব চৌধুরী লাল সেলাম।
জন্ম : ১২ ডিসেম্বর, ১৯১১ প্রয়াণ : ২১ ডিসেম্বর ১৯৯৭

পশ্চিমবঙ্গে দুর্নীতি ও অরাজকতা চরমসীমায়

পশ্চিমবঙ্গের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি বেশ কিছুকাল ধরেই অতি যন্ত্রণাময়। এরাজ্যের অবস্থা অবশ্যই সঠিকভাবে দেশ কাল নিরপেক্ষ হতে পারে না। মোদী-সরকার ভারতের জনজীবনে যে অস্থিরতা নির্মাণ করে চলেছে, তারই আভাস পশ্চিমবঙ্গেও। কর্মহীনতা, শিক্ষাক্ষেত্রে চরম অরাজকতা, সমস্ত জিনিসপত্রের আকাশছোঁয়া মূল্যবৃদ্ধি, সামাজিক সন্ত্রাস ও বিদ্বেষের রমরমা এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নীতিহীনতার বিস্তার ঘটে চলেছে দুরন্ত বেগে। রাজ্যের শ্রমকারি মানুষদের জীবনে চরম নৈরাজ্য স্বাভাবিক ও ক্রমশ আরও বেড়ে যাবার লক্ষণগুলি স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হচ্ছে। ২০১১ সালে মমতা ব্যানার্জীর ক্ষমতা দখল যে উদ্দেশ্যে হয়েছিল, তাই এখন এক ঘোর বাস্তবতা।

মমতা ব্যানার্জী রাজ্যের মানুষের একাংশকে ধোঁকা দিয়ে, মিথ্যা প্রচার করেই রাজ্য সরকারের দখলদারি নিশ্চিত করেছিলেন। একের পর এক মিথ্যার প্রতিশ্রুতি দিয়ে গেছেন। একদিকে মোদী সরকার ও পশ্চিমবঙ্গের মমতা সরকারের কর্মধারায় কোনো ফারাক নেই। এরা দেশের বা রাজ্যের সাধারণ মানুষের জীবনে কোনো সদর্থক উন্নয়নের কথা ভাবেনই না। এরা উভয়েই একান্তভাবে সংকটাকীর্ণ আগ্রাসী পুঁজিবাদের বিশ্বস্ত ক্রীড়নক। একই সূত্র থেকে সুপরিকল্পিত নির্দেশে এদের দৈনন্দিন কর্মধারাও নিশ্চিত হয়। বলতে গেলে নয়া উদারবাদী প্রস্তাবনার অন্যতম বিশেষ প্রকল্প—সাধারণ মানুষকে রাজনীতি বিমুখ করে পুঁজির ভয়াবহ শোষণ নিপীড়নের তীব্রতা আড়াল করা। তা হলে প্রতিবাদী ভূমিকা অল্প কিছু মানুষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে এবং প্রকৃত বিচারে কোনো ব্যাপক গণআন্দোলন গড়ে উঠতে পারবে না।

মোদীর অবশ্যই নির্দিষ্ট নীতি আছে। যত বীভৎসই হোক না কেন, নাগপুরের নির্দেশগুলিই তাঁর কাছে চূড়ান্ত। প্রবল বেগে উগ্র হিন্দুত্ববাদী আধিপত্যবাদ প্রতিষ্ঠার পথে চলে বিজেপি। সেই লক্ষ্য বাস্তবায়িত করতে যা যা করা প্রয়োজন, মোদী সরকার তাই করে। দেশ বিদেশের কর্পোরেট কোম্পানিগুলিকে অঢেল সুবিধা পাইয়ে দিয়ে তাদেরও 'হিন্দি-হিন্দু-হিন্দুস্থান' নির্মাণের পথে চালিত করা হচ্ছে। প্রকারান্তরে মমতা ব্যানার্জীও সেই পথেই চলেছেন এবং নাগপুর বিষচক্রর নির্দেশ মতোই চলছেন। গভীর সখ্য।

পশ্চিমবঙ্গের ঐতিহ্যবাহী বামগণতান্ত্রিক আন্দোলনের পীঠস্থানকে ধ্বংস করে বামপন্থী আন্দোলনের কর্মী নেতাদের বিপর্যস্ত করা তৃণমূল কংগ্রেসের এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বাড়তি দায়িত্ব। মোদীর পথে বামপন্থীরাই কাঁটা হতে পারেন। তাদের বদনাম করে, ভীতি সৃষ্টি করে এমন কি, একাংশকে উৎকোচ দেবার মাধ্যমেও মমতা ব্যানার্জী বিশেষ যোগ্যতার সঙ্গে এই অপকর্ম করে চলেছেন। সাধারণ মানুষ হতাশ এবং নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ছেন। রাজনীতির নামে তৃণমূল কংগ্রেস ও বিজেপি যে নীরবতার পরিচয় দিয়ে চলেছে তা, সুস্থ সামাজিক বোধসম্পন্ন মানুষের কাছে ঘৃণার বিষয় হলেও মুখ ফুটে বলতে বা প্রত্যক্ষভাবে প্রতিবাদী হতে সাহস হয়তো পাচ্ছেন না। তৃণমূল

—এরপর ৪-এর পাতায়

গৃহ শ্রমিকদের ন্যূনতম পারিশ্রমিক প্রসঙ্গে

দিল্লী, কেরল, তামিনাড়ু সহ দশটি রাজ্যে গৃহ সহায়ক শ্রমিকদের ন্যূনতম পারিশ্রমিক আইনের (১৯৪৮) অন্তর্গত করা হয়েছে ইতিমধ্যেই। পশ্চিমবঙ্গে শ্রমমন্ত্রীর আশ্বাস আগামী তিনমাসের মধ্যে এই রাজ্যেও গৃহশ্রমিকদের ন্যূনতম পারিশ্রমিক নির্ধারণ করা হবে, কেন্দ্রের হিসাব অনুযায়ী আনুমানিক চল্লিশ লক্ষ গৃহশ্রমিক সারা দেশে কর্মরত তাঁদের অধিকাংশই মহিলা। পশ্চিমবঙ্গে অন্তত আড়াই লক্ষ মহিলা কেন্দ্রের ই-শ্রম পোর্টালে নিজেরে 'গৃহশ্রমিক' পরিচয় দিয়ে নাম নথিভুক্ত করেছে।

২০১৯ সালের কেন্দ্রের গৃহশ্রমিকদের জন্য জাতীয় নীতিতে অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিকদের মতোই গৃহশ্রমিকদের ন্যূনতম বেতন, সম্মানজক ব্যবহার, নির্যাতন ও বঞ্চনা থেকে সুরক্ষার অধিকারের মতো সুবিধাগুলি দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। কর্মক্ষেত্রে হয়রানির প্রতিকারের অবসানে বিশেষ বিচারব্যবস্থার সুপারিশও রয়েছে।

দেশের বর্তমান আর্থসামাজিক পরিস্থিতিতে বিষয়টি এতই জটিল যে আইন তৈরি হলেও তাকে কার্যকর করা তেমন সহজ নয়। প্রসঙ্গত রান্না, শিশুপালন বা বয়স্কদের পরিচর্যার জন্য যথেষ্ট দক্ষতার প্রয়োজন হলেও গৃহশ্রমিকদের অদক্ষ শ্রমিক হিসাবেই গণ্য করা হয়, পশ্চিমবঙ্গে গৃহশ্রম সম্ভবত মেয়েদের বৃহত্তম কর্মক্ষেত্র, এই ক্ষেত্রে এতাবৎকাল অবহেলিত গৃহশ্রমিকদের মানবউন্নয়নের স্বার্থেই যথাযথ মজুরি, নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে সরকার দায়বদ্ধ। শুধুমাত্র আইন প্রণয়নই যথেষ্ট নয়, আইনের বাস্তবায়নের জন্য সরকার এবং জনগণের সুসংহত উদ্যোগও প্রয়োজন।

২০২২ সালের শুরুতে আন্তর্জাতিক অর্থনীতির বৃদ্ধির পূর্বাভাস অলীক আশ্বাসে পরিণত হতে চলেছে

অতিমারির দুর্যোগ অবসানের পর যেভাবে ২০২১ সালে আন্তর্জাতিক অর্থনীতি ঘুরে দাঁড়াতে শুরু করেছিল, আশা করা হয়েছিল, ২০২২ সালে নতুন উচ্চতায় পৌঁছাতে পারে অর্থনীতি। বছরের (২০২২) শেষ মাসটিতে দেখা গেল নিঃসন্দেহে এমন আশা দুরাশায় পরিণত হতে চলেছে।

মূল্যবৃদ্ধির ধাক্কা সামালাতে বছরের শুরুতে আমেরিকার ফেডারেল রিজার্ভ সুদের হার বৃদ্ধি করে বাকী দুনিয়াও তাকে অনুসরণ করতে দেরি করেনি। ফলে লগ্নি পুঁজিও আমেরিকামুখী হল। ডলারের দাম বাড়ল; আন্তর্জাতিক বাজারে তার নেতিবাচক প্রতিক্রিয়াও হয়। উপরন্তু, রুশ-ইউক্রেন যুদ্ধের ফলে খাদ্যশস্যের অন্যতম বৃহৎ রপ্তানিকারক দুটি দেশ ইউক্রেন ও রাশিয়ার খাদ্য শস্য (গম, ভুট্টা, সূর্যমুখী বীজ) রপ্তানিতে ঘাটতি পড়ে।

গোদের উপর বিষফোঁড়ার মতো রাশিয়ার বিরুদ্ধে ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞার ফলে পেট্রোলিয়াম ও অন্যান্য পণ্যের বাজারেও তীব্র নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া পড়ে। সব মিলিয়ে খাদ্য পণ্যের বাজারে যে অস্থিরতা তৈরি হয়েছে তা গত ৫০ বছরের মধ্যে সর্বাধিক খাদ্য অনিশ্চয়তা সৃষ্টি করেছে। এরই মধ্যে আবার ফিরে এসেছে চিনে কোভিড অতিমারি। বিশ্বের অন্যান্য দেশে এই অতিমারি নিয়ন্ত্রণে থাকলে চিনের বর্তমান পরিস্থিতি অত্যন্ত আশঙ্কাজনক বলে মনে হয়, সারা বিশ্বের বিমান যোগাযোগ এখন স্বাভাবিক, কোভিড অতিমারি ফের বিশ্বে ছড়িয়ে পড়তেই পারে। বৈশ্বিক অর্থনীতির পূর্বাভাসেও নিম্নমুখী ঢল এবং গোটা দুনিয়া এক বিপুল আর্থিক মন্দার কিনারে দাঁড়িয়ে আছে। পাশাপাশি বিশ্ব উষ্ণায়নের বিপদও ঘাড়ের উপর নিঃশ্বাস ফেলছে। বর্তমান পরিস্থিতিতে সামগ্রিক পরিস্থিতির মোকাবিলার জন্য যে সুসংহত উদ্যোগের প্রয়োজন তা এখনও অধরা। অনিশ্চয়তার অন্ধকারের মধ্য দিয়েই ২০২৩ সালের যাত্রা শুরু হতে চলেছে।

চলচ্চিত্র জগতের মহানক্ষত্র অমিতাভ বচ্চনের উৎকণ্ঠা

এ বছরের কলকাতায় চলচ্চিত্র উৎসবের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে দেশে মত প্রকাশের স্বাধীনতা খর্ব হচ্ছে বলে উৎকণ্ঠা প্রকাশ করেছেন অমিতাভ বচ্চন। অমিতাভের বক্তব্য নিয়ে জাতীয় সংবাদ মাধ্যমে ঝড় উঠেছে। বর্তমান সময়ে চলচ্চিত্রের প্রাসঙ্গিকতা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি বলেছেন আশঙ্কার বিষয়, দেশে এখন নাগরিক স্বাধীনতা এবং মত প্রকাশের স্বাধীনতা নিয়েও প্রশ্ন তোলা হচ্ছে। কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্যে শাসক দল যে ভাবে বাক্ স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করছে তার প্রেক্ষিতে অমিতাভের মন্তব্য যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ বলেই মনে হয়।

প্রসঙ্গত, চলচ্চিত্র উৎসব মঞ্চে উপস্থিত বলিউডের অপর নক্ষত্র শাহরুখ খান তাঁর নতুন সিনেমা 'পাঠান' নিয়ে ভারতীয় জনতা পার্টির একাংশে আপত্তির প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, 'সোস্যাল মিডিয়া কখনও কখনও ক্ষুদ্র মানসিকতা দ্বারা পরিচালিত হয়। এই নেতিবাচক মানসিকতার কারণে সোস্যাল মিডিয়ার প্রতি আকর্ষণ বাড়ছে যা, ধ্বংসের মানসিকতাকে প্ররোচিত করছে. শাহরুখ খানের ভাষণের পরই অমিতাভ বাক্ স্বাধীনতা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। তাছাড়া এই অনুষ্ঠানে অমিতাভ বলেন ফ্যাসিবাদ, অপবিজ্ঞান, সামাজিক কুসংস্কার এবং আরও নানা বিষয়ে মন্তব্যগুলিও বিদ্বজ্জন এবং উপস্থিত দর্শকবৃন্দের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে। চলচ্চিত্র উৎসবের অনুষ্ঠানে অমিতাভ বচ্চনের বক্তব্য নিঃসন্দেহে এক ব্যতিক্রমী ঘটনা।

কসাই মোদী

রাষ্ট্রপুঞ্জের মঞ্চে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে 'গুজরাটের কসাই' বলে আক্রমণ করেছেন পাকিস্তানের নয়া বিদেশমন্ত্রী বেনজির পুত্র বিলাবল ভুট্টো জারদারি। সম্প্রতি রাষ্ট্রপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদের বৈঠকে বিলাবল বলেছেন, ওসামা বিন লাদেন নিহত হয়েছেন কিন্তু 'গুজরাটের কসাই' বর্তমানে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এখনও জীবিত। তিনি আরও বলেন, প্রধানমন্ত্রী হওয়ার আগে পর্যন্ত মোদীর আমেরিকায় প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল। মোদী হিটলারের এস এস এর আদর্শে অনুপ্রাণিত রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের প্রধানমন্ত্রী।

রাষ্ট্রপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদের সভায় ভারতের বিদেশমন্ত্রী জয়শঙ্কর ২০০১ সালে ভারতের সংসদে হামলার ঘটনা এবং লাদেনকে পাকিস্তানে আশ্রয় দেওয়ার প্রসঙ্গ তুলেছিলেন। তারই প্রতিক্রিয়ায় এই মন্তব্য করেছেন বিলাবল ভুট্টো জারদারি।

কোভিড অতিমারির প্রবল পুনরাবির্ভাব

কোভিড অতিমারির প্রবল পুনরাবির্ভাবের ফলে চিনের এখন বড় শহরগুলিতে রাস্তাঘাট জনশূন্য, দেশের উত্তর থেকে দক্ষিণ পর্যন্ত প্রায় সব শহরাঞ্চলে চিনের নাগরিকেরা কোভিড থেকে বাঁচার জন্য নিজেদের গৃহবন্দী করেছেন। চলতি শীতের মরসুমে, চিনে কোভিডের তিনটি ঢেউ আছড়ে পরবে বলে চিনের বিশেষজ্ঞদের অভিমত। বর্তমান আক্রমণটিকে 'প্রথম ঢেউ' বলেই চিহ্নিত করা হয়েছে। আগামী মাসে কোভিড আক্রমণ তীব্রতর রূপে ঘটবে, এমন আশঙ্কাই করছেন বিশেষজ্ঞরা। প্রশাসন চিনে কোভিড আক্রমণ প্রতিহত করতে কোনো ঢিলেমি বরদাস্ত না করার (Zero tolerance policy) নীতি গ্রহণের পর জনগণের বিক্ষোভ চরম পর্যায়ে উঠেছিল। চিন সরকার আচমকাই সব কড়াকড়ি উঠিয়ে নেয়। ব্যাপকহারে গণ পরীক্ষার নীতি এখন পরিত্যক্ত হওয়ার ফলে কোভিড আক্রমণের ব্যাপকতার কোনো নির্ভরযোগ্য সংবাদ পাওয়াটাও অসম্ভব হয়ে উঠবে বলেই মনে হয়।

চিনের প্রধান বিশেষজ্ঞ (Chief epidemiologist) সম্প্রতি এক সম্মেলনে বলেছেন, আগামী তিন মাসের মধ্যে চিনের মানুষ পর পর তিনটি কোভিড সংক্রমণের ঢেউয়ের কবলে পড়বে। বর্তমান ঢেউটি জানুয়ারীর মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত চলবে।

নেপালের রাষ্ট্রপতি রাজনৈতিক দলগুলিকে ২৫ ডিসেম্বরের মধ্যে সরকার গঠনের জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছেন

সদ্য অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনের পর নেপালে কোনো রাজনৈতিক দলই নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অজনে ব্যর্থ হওয়ার ফলে এক রাজনৈতিক অচলাবস্থা তৈরি হয়েছে। ২০ নভেম্বর অনুষ্ঠিত নির্বাচনের ফলাফল রাষ্ট্রপতির কাছে নির্বাচন কমিশন পেশ করার পর দেখা যাচ্ছে নেপালের পার্লামেন্টে কোনো দলের পক্ষেই এককভাবে সরকার গঠন অসম্ভব। ২৭৫ আসনবিশিষ্ট পার্লামেন্টে ৮৯টি আসনে জয়ী নেপাল কংগ্রেসের নেতা শেরবাহাদুর দেউবাই সরকার গঠনের প্রধান দাবিদার হতে পারেন। মাওবাদী কেন্দ্র ৩২টি আসনে জয়ী হলেও সরকার গঠনে কোয়ালিশন মন্ত্রীসভায় নেতা হিসাবে পুষ্পকুমার দাহাল প্রচন্ডের দাবিও সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে। কোনো দলের একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা না থাকায় রাষ্ট্রপতি বিদ্যাদেবী ভাণ্ডারী সংবিধানের ৭৬(২) ধারা অনুযায়ী দুই বা তিন দলের কোয়ালিশনে সরকার গঠনে অনুমোদন দেবেন বলেই মনে হয়।

মোদী সরকার এবং সর্বোচ্চ আদালতের মধ্যে বর্তমান বিচারপতি নিয়োগ (কলেজিয়াম) ব্যবস্থা নিয়ে বিরোধ অব্যাহত

দেশের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার অন্যতম স্তম্ভ বিচারব্যবস্থার স্বাধীনতার উপর ভারতীয় জনতা পার্টির নেতৃত্বে পরিচালিত সরকারের হস্তক্ষেপের চক্রান্তের ফলে এক উদ্বেগজনক পরিস্থিতি সৃষ্টি হতে চলেছে।

গত বৃহস্পতিবার ১৫ ডিসেম্বর রাজ্যসভায় আদালতে বিপুল পরিমাণ বকেয়া বিচার প্রক্রিয়ার উল্লেখ করে কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী কিরেন রিজিজু বলেছেন, সর্বোচ্চ আদালতের বিচারপতি নিয়োগের সমস্যার জন্য বর্তমানের প্রচলিত কলেজিয়াম ব্যবস্থাই দায়ী এবং বিচারপতি নিয়োগের নতুন ব্যবস্থা না হলে, এমন অব্যবস্থা চলতেই থাকবে। তাছাড়া আদালতে দীর্ঘ ছুটির ব্যবস্থাও বিচারপ্রার্থীদের হয়রানির কারণ বলে কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী মন্তব্য করেছেন। আইনমন্ত্রীর কলেজিয়াম ব্যবস্থার উপর এই আক্রমণের পাশাপাশি বর্তমান উপরাষ্ট্রপতি ২০১৫ সালের সর্বোচ্চ আদালতের National Judicial Appointment Commission Act কে খারিজ করার প্রসঙ্গ তুলে মন্তব্য করেছেন বর্তমান কলেজিয়াম ব্যবস্থা পার্লামেন্টের স্বাধীনতা এবং জনাদেশের উপর আঘাত রূপেই বিবেচনা করা উচিত।

স্বশাসিত বিচার ব্যবস্থার উপর ক্ষমতাসীন সরকারের পরিকল্পিত আক্রমণের প্রসঙ্গে কংগ্রেস দলের মুখপাত্র জয়রাম রমেশ বলেছেন বিভিন্ন স্তরে বিচার ব্যবস্থার উপর পরিকল্পিত আক্রমণ এবং NJAC দের চালু করার প্রচেষ্টার মাধ্যমে বর্তমান স্বশাসিত বিচার ব্যবস্থাকে বাগে আনার চক্রান্ত চলছে। লোকসভার সাংসদ শশী থারুর -এর মন্তব্যও এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য। প্রচলিত বিচার ব্যবস্থাকে প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণাধীন করার লক্ষ্যেই বিচারপতি নিয়োগের মুহূর্তেই সর্বোচ্চ আদালতের ক্ষমতার রাশ টানার অপচেষ্টা বলে সাংসদ শশী থারুর মন্তব্য করেছেন। তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা সাংসদ সুখেন্দুশেখর রায় বলেছেন যদিও তার দল ২০১৪ সালে NJAC কে সমর্থন করলেও বর্তমান সরকার বিচার ব্যবস্থা সহ নানা ক্ষেত্রে সাংবিধানিক অধিকার খর্ব করার চক্রান্ত করছে বলে তার দল দলের অবস্থান পুনর্বিবেচনার চিন্তা করছে। আসলে বর্তমানের পঙ্গু অসুস্থ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায়, কলেজিয়াম ব্যবস্থা বনাম NJAC চলমান দ্বন্দ্বের সমাধান সহজে হবে না।

মার্কসীয় দর্শন এবং রাজনৈতিক অর্থনীতির ‘প্রোলেতারিয়ান ডিক্টেটরশিপ’

পার্থসারথি দাশগুপ্ত

‘ডিক্টেটরশিপ’ শব্দটি মার্কস-এঙ্গেলস যেভাবে বোঝাতে চেয়েছিলেন সেখান থেকে কিছু ঐতিহাসিক কারণেই তা ক্রমশ চূড়ান্ত কর্তৃত্ববাদ, অথরিটি, হেজিমনি বা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার একাধিপত্য ইত্যাদি অর্থে বা সংজ্ঞায় বিচ্যুত হয়ে পড়েছে। সরাসরি বলতে গেলে মার্কস-এঙ্গেলস ‘প্রোলেতারিয়ান ডিক্টেটরশিপ’ বলতে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের স্তরে বা উৎক্রমণকালে গণতন্ত্রের উন্নততম অনুশীলনের যাত্রাপথে একটি অস্থায়ী রাজনৈতিক অবস্থা বোঝাতে চেয়েছেন। সেই বিশেষ উৎক্রমণকালে প্রোলেতারিয়েত শ্রেণি এক অস্থায়ী ক্রমবিলীয়মান রাষ্ট্রব্যবস্থাকে তাদের নিজেদের শ্রেণিসহ পণ্যের নিয়মের বিলোপের লক্ষ্যে বুর্জোয়া ডিক্টেটরশিপের (তথাকথিত বুর্জোয়া গণতন্ত্রের) বা শাসন ক্ষমতার সমস্ত শর্তগুলিকে ধ্বংস করছে। কারণ বুর্জোয়া গণতন্ত্রে প্রাপ্ত গণতান্ত্রিক অধিকারের তুলনায় তাঁদের গুণগতভাবে মৌলিক এবং উন্নততম গণতন্ত্রের অনুশীলনের পথে যেতে হবে। যে অর্থনৈতিক কাঠামোর ওপর বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক উপরিকাঠামো, পেরিয়ে আসা অন্যান্য শোষণমূলক সমাজের উপরিকাঠামোর অবশেষ সহ গড়ে উঠেছিল, তা কখনোই পুঁজিবাদী উদ্বৃত্ত শ্রম শোষণভিত্তিক মূল্যের বিধিবিধানকে অতিক্রম করে উঠতে পারছিল না। এবার এই উৎক্রমণকালে সর্বহারা শ্রেণির কাজ একদিকে পুরানো অর্থনৈতিক কাঠামোটাকে ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়া, সঙ্গে সঙ্গে নিজেরাই বিষয়ীতে উত্তীর্ণ হয়ে উন্নততম গণতন্ত্রের সুপারস্ট্রাকচারটা মজবুতভাবে গঠন করা। খুব স্বল্পকথায় গোথা কর্মসূচির সমালোচনা প্রসঙ্গে প্রোলেতারিয়েত শ্রেণির একনায়কত্বের বিষয়টি তুলে ধরেছেন মার্কস ঃ–

“Between capitalist and communist society lies the period of the revolutionary transformation of the one into the other. Corresponding to this also a political transition period in which the state can be nothing but the revolutionary dictatorship of the proletariat.” মার্কস-এঙ্গেলস দর্শন এবং পোলিটিকাল ইকোনমির বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে প্রমাণ করেছেন যে ‘শ্রমিক শ্রেণির মুক্তি শ্রমিক শ্রেণিরই কাজ’।

তাঁরা দেখিয়েছেন, মহান কোনো আবিষ্কার, চিন্তানায়ক বা মহাপুরুষের আবির্ভাব অথবা শ্রেষ্ঠ দার্শনিক তত্ত্ববিদের হস্তক্ষেপ নিরপেক্ষভাবে এই ঐতিহাসিক পরিণতি ঘটাতে বাধ্য। অর্থাৎ পুরানো অর্থনৈতিক কাঠামো ও সুপারস্ট্রাকচারের ধ্বংস এবং শ্রেণিশোষণহীন অর্থনৈতিক কাঠামো নির্মাণের সঙ্গে সঙ্গে সেই কাঠামোর সহযোগী সুপারস্ট্রাকচার গঠনের প্রক্রিয়া চালিয়ে যাওয়া অবশ্যই শ্রমিকশ্রেণির কোনো এজেন্টের কর্ম নয়। গুটিকয় অতিজ্ঞানী সর্বত্যাগী বিপ্লবীর স্বেচ্ছাসেবিতামূলক চূড়ান্ত কর্মসূচি গ্রহণেও তা সম্ভব নয়। অথবা ইতিহাস এই পরিণতির যাথার্থ নির্দেশ করে, সুতরাং চরম নির্ধারণবাদী কর্মসূচি গ্রহণের মাধ্যমে শ্রমিক শ্রেণিকে এই রূপান্তরের কাজ স্বতঃস্ফূর্তভাবে অতি সহজেই করার শর্ত তৈরী করবে, তাও নয়।

সুতরাং সর্বহারা শ্রেণিকে নিজেদের মধ্যেই নিজেদের সচেতন বিষয়ীতে উত্তীর্ণ হয়ে বুর্জোয়াশ্রেণির সমস্ত ধরনের আধিপত্যের প্রভাব, বন্ধন ও শ্রেণিশোষণের শেষ চিহ্নগুলি টিকিয়ে রাখার লক্ষ্যে বুর্জোয়া শ্রেণির হিংস্র আক্রমণগুলি বিচূর্ণ করে যাবে, করেই যাবে। ধ্বংস করে যাবে পুঁজিবাদী উৎপাদন প্রক্রিয়ার শাসন বিধান সামরিক প্রতিক্রিয়া সহ সামাজিক সাংস্কৃতিক অমঙ্গলকর অমানবিক উপরিকাঠামো।

এজন্য সংখ্যাগুরুর শাসনের স্বার্থে বিশেষ ঐতিহাসিক কালে সংখ্যালঘুর উপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনে যে অস্থায়ী বিলীয়মান রাষ্ট্রযন্ত্রটি প্রোলেতারিয়েতের আধিপত্যে বাধ্য হয়েই আধারাষ্ট্র রূপে ব্যবহার করতে হচ্ছে, পুরনো শোষণমূলক রাষ্ট্রযন্ত্রের মতো তা সমগ্র সমাজের ওপর চেপে বসা বিচ্ছিন্ন রাষ্ট্রযন্ত্র নয়। তবুও মানুষের প্রাক্-ইতিহাসের অবসানের ঐতিহাসিক দায়বদ্ধতায় কর্তৃত্বমূলক (dictatorial) প্রয়োজনে সংখ্যালঘু শোষকশ্রেণির বিরুদ্ধে দখলকারী হিংসাত্মক কাজগুলি ঐ উৎক্রমণকালে সর্বহারা শ্রেণিকে করতেই হচ্ছে। লক্ষ্য, বাধ্যতামূলকভাবে ঐসব হিংসাত্মক কাজগুলির সার্বিক প্রয়োজনের অবলুপ্তি— শ্রেণিহীন গণতন্ত্রই হবে ঐ সময়ে সর্বহারা শ্রেণির একমাত্র লক্ষ্য।

শ্রেণির উদ্ভব এবং শ্রেণি বিলুপ্তির ধারণার প্রেক্ষিতে ব্যক্তিসত্তার উদ্ভবের ঐতিহাসিক বিকাশ যে বুর্জোয়া মূল্যবোধের সূত্রপাতের অনেক আগেই ঘটেছে তা প্রমাণ করেছেন মার্কস-এঙ্গেলস জার্মান ইডিওলজিতে। সেই বিষয়টির উপর সমধিক গুরুত্ব দিয়েছেন ওঁরা। প্রতিটি শ্রেণিবিভক্ত সমাজে শুধুমাত্র বেঁচে থাকার বাস্তব তাগিদেই মানুষ একে অপরের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়। শুধুমাত্র একটি বিশেষ শ্রেণির বিরুদ্ধে উদ্বৃত্ত শ্রম শোষণের বিশেষ ধরনের জন্যই বহু সংখ্যক একক ব্যক্তিকে সমস্বার্থে একটি বিশেষ শ্রেণির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত অর্থাৎ subsumed হতে হয়। সুতরাং একক ব্যক্তি তাঁর বেঁচে থাকার শর্তগুলি যে বিশেষ সূত্রে গ্রথিত, সেই বাস্তবতাটাকেএড়িয়ে যেতে পারে না বলেই নিজস্ব শ্রেণির সামগ্রিক সমসত্ত্ব চরিত্রের অঙ্গীভূত হয়ে পড়ে। এভাবেই মার্কস-এঙ্গেলস-এর মূল্যবান হাইপোথিসিসের যৌক্তিক ভূমি প্রস্তুত হয়। তাই জার্মান ইডিওলজির মূল বক্তব্য, সামাজিক তথা অর্থনৈতিক শ্রেণিসমূহ শ্রেণিভুক্ত একক ব্যক্তির তুলনায় অনেক বেশি পরিমাণে একটি বিশেষ লক্ষ্যে শ্রেণির সকলের স্বার্থ রক্ষা করতে সক্ষম। আর একক ব্যক্তি সত্তার এই বিশেষ শ্রেণির মধ্যে subsume বা মিশে যাওয়ার প্রক্রিয়া তখনই মিলিয়ে যাবে, যখন শ্রেণিসমূহের বিলুপ্তি ঘটবে। এভাবেই কার্ল মার্কস একক ব্যক্তির সামাজিক উৎপাদন প্রক্রিয়ার ভূমিকা ও তাঁর চেতনার বিকাশকে ইতিহাস নির্দিষ্ট ঘটনা বলে ব্যাখ্যা করেছেন। তাই মানব সমাজের বিবর্তনের গতি তাঁর কাছে নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক বস্তুবাদী প্রক্রিয়া।

দর্শনের ভিত্তিতে সামাজিক বিবর্তনের তত্ত্ব প্রতিষ্ঠার পর ১৮৬৫ সালে মূল্যের শ্রমতত্ত্ব এবং পুঁজিবাদী অর্থনীতির কাঠামোজাত সংকট ইত্যাদি সম্পর্কিত গবেষণার মধ্য দিয়ে পুঁজিবাদের ঐতিহাসিক পর্যায়কে অন্যভাবে ব্যাখ্যা করেন। উৎপাদনের উপকরণ-এর সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক তথা বহু ব্যক্তিমানুষের সামবায়িক ঐক্য, শ্রেণিবিভক্ত সমাজে সেই ঐক্যের ফাটল, অবক্ষয়, বিচ্ছিন্নতা। অবশেষে সেই আদিম ঐক্যের পরিশীলিত উন্নত পুনর্সৃজন। ব্রিটেনের শ্রমিক শ্রেণির কাছে বক্তৃতায়, ‘Original Union’, ‘its decompositon’ এবং ‘restoration of original union in new historical form’ রূপে ঐতিহাসিক স্তরগুলি ব্যাখ্যা করেন। সেই প্রখ্যাত বক্তৃতারও দশ বছর পরে সর্বহারাশ্রেণির ঐতিহাসিক ভূমিকা সম্পর্কিত ব্যাখ্যা করতে গোথা কর্মসূচির সমালোচনা প্রসঙ্গে সেই ‘original union’ এ উৎপাদনের শর্ত—প্রকরণ প্রভৃতির নিরিখে আদিম অন্বয় থেকে যে ঐতিহাসিক স্তরে ‘separation’ অনন্বয় বা বিচ্ছিন্নতা থেকে সর্বশেষ উন্নতমতম মাত্রার অন্বয় অর্থাৎ ‘restoration of the original union in a new historical form’ কেই মার্কস সমাজতন্ত্র বা সাম্যবাদ বলে বোঝাতে চেয়েছেন।

এই ‘restoration to original union’ এর কাজটাই উৎক্রমণকালে সচেতন বিষয়ীতে উত্তীর্ণ শ্রমকারী শ্রেণির কাজ। বাস্তবে পুঁজিবাদী সমাজে শ্রমজীবী মানুষের অর্থাৎ অধিকাংশের ব্যক্তি-মালিকানার অবসানটা তো হয়েই গেছে। এবারের কাজ যে ন্যূনতম সংখ্যক মানুষের হাতে পুঁজির স্বার্থে উৎপাদন প্রকরণের মালিকানা এসেছে তারও অবসান করা। পুঁজিপতি শ্রেণির একচ্ছত্র একাধিপত্য যে রাষ্ট্রব্যবস্থার সহায়তায় উৎপাদনের প্রকরণের মালিকানা দখল করেছিল এতদিন, তাকে ধ্বংস করবে সর্বহারা শ্রেণির একনায়কত্ব। সাময়িক কালপর্যায়ে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব চলাকালীন উৎক্রমণকালে উৎপাদনের প্রকরণের উপর কেন্দ্রীভূত অধিকারকে রাষ্ট্রের অধিকার বলতে চাননি মার্কস, ‘সামাজিক মানুষের যৌথ সামাজিক অধিকার ধরনের’ কিছু বলে বার বার বোঝাতে চেয়েছেন। সমগ্র উৎপাদক সমাজের বদলে কোনও দল, গোষ্ঠী, আমলাতন্ত্র বা একক ব্যক্তির আধিপত্য প্রতিষ্ঠার প্রবণতাগুলি ধ্বংস করার লক্ষ্যে এই সামাজিকীকরণ কিন্তু রাষ্ট্রীয়করণ নয়। বিভিন্নভাবে বারংবার মার্কস-এঙ্গেলস তত্ত্ব ও অনুশীলন, উভয়ের প্রেক্ষিতেই এই বিষয়টির অবতারণা করেছেন।

সমাজতন্ত্রে উত্তরণের লক্ষ্যে উৎক্রান্তিকালীন সমাজকে মার্কস কখনোই সমাজতান্ত্রিক সমাজ বলে চিহ্নিত করেননি। এই সর্বহারাশ্রেণির একনায়কত্বে চলাকালীন সমাজে সম্পত্তি সম্পর্ক, সামাজিক শ্রম, বিনিময় মূল্য, মূল্যের বিধি বিধান কোনোদিক দিয়েই তখনই সমাজতন্ত্রের গুণগত মাত্রায় উত্তীর্ণ হয়নি। সুতরাং কাঁঠালের আমসত্ত বা সোনার পাথরবাটির মতো শ্রেণি থাকবে, পণ্যমূল্য-বাজার থাকবে, উদ্বৃত্ত শ্রমশোষণ থাকবে—তাকে সমাজতন্ত্র বা সাম্যবাদ বলাই চলে না।

আপাতদৃষ্টিতে গণতন্ত্র ও একনায়কত্ব শব্দদ্বয়কে পরস্পর বিরোধী শব্দ বলে মনে হলেও ‘ডিক্টেটরশিপ’ শব্দটিকে মার্কস সর্বপ্রথম জার্মানীর বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব চলাকালীন পর্যায়ে ‘ডিক্টেটরশিপ অফ দি ডেমোক্রেসী’ শব্দরূপে ব্যবহার করেছেন। ১৮৪৮-৪৯ সালে শ্রমিক শ্রেণি, কৃষক সম্প্রদায় ও নিম্নবিত্ত পেটিবুর্জোয়া গোষ্ঠীর মোর্চাকে ‘দি ডেমোক্রাট’ বলে চিহ্নিত করা হত। সংগ্রামী, গণতান্ত্রিক শ্রেণির মোর্চার মিলিত জঙ্গী আন্দোলন এবং সমাজে এদের যৌথ আধিপত্য প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেছেন মার্কস-এঙ্গেলস। অর্থাৎ ডিক্টেটরশিপের অর্থ অভিজাততন্ত্র সহ তথাকথিত উদারনৈতিক প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে বলপ্রয়োগের শক্তি অর্জনকারী গণতান্ত্রিক মঞ্চের আধিপত্যের প্রয়োজনীয় অবস্থা। মার্কস সুস্পষ্টভাবে অচল প্রশাসনের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়ার শক্তির বিকল্পে গণতান্ত্রিক একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠার ওপর জোর দেন। অর্থাৎ যা প্রতিক্রিয়ার শক্তির কাছে শোষিত শ্রেণির একনায়কত্ব, তা-ই খেটে খাওয়া মানুষের কাছে গণতন্ত্র। বাস্তবে রাজতন্ত্রে যে মাত্রায় গণতন্ত্র ছিল, তার তুলনায় উন্নততর গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্যই সংগ্রামী শ্রেণির গণতান্ত্রিক শাসন বা একনায়কত্ব প্রয়োজন।

জার্মানীর গণতান্ত্রিক আন্দোলনের অভিজ্ঞতা-ঋদ্ধ মার্কস-এঙ্গেলস সর্বহারাশ্রেণির ঐতিহাসিক ভূমিকার বৈজ্ঞানিক ভিত্তি সুপ্রতিষ্ঠিত করার বাস্তব কারণসমূহ এভাবেও ব্যাখ্যা করলেন। বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবে পেটিবুর্জোয়া বা উদারনৈতিক বুর্জোয়া গোষ্ঠীগুলির দোলায়মান শ্রেণিচরিত্র তুলে ধরেন। সর্বহারা শ্রেণির সর্বময় কর্তৃত্ব বা হেজিমনিই একমাত্র শোষণমুক্ত সমাজের কাণ্ডারী। মার্কসীয় চেতনায় এভাবেই বৈজ্ঞানিক সত্য সহ পূর্বোক্ত উৎপাদন প্রকরণের উপর সামাজিক আধিপত্য নির্মাণকারী সমাজের লক্ষ্যে সক্রিয় শ্রেণি বা original union restoration-এর জন্য associated producer অর্থাৎ সর্বহারাশ্রেণির একনায়কত্ব (Proletarian dictatorship) গণতান্ত্রিক একনায়কত্বের শ্লোগানকে প্রতিস্থাপিত করল।

মার্কস প্রোলেতারিয়েতের একনায়কত্বের বিপ্লবী ভূমিকা সম্পর্কে সুস্পষ্ট বাস্তব অভিজ্ঞতা ভিত্তিক বক্তব্য রাখলেন সর্বপ্রথম ‘দি ক্লাস স্ট্রাগল ইন ফ্রান্স’-এ। পুঁজিপতি শ্রেণির শাসনকে তিনি সেই শ্রেণির একনায়কত্ব হিসাবে প্রতিটি বাক্যে ও অর্থে ব্যবহার করেছেন। বুর্জোয়া-শ্রেণিশাসন বা একনায়কত্বের বিভিন্ন ধরনধারণ থাকলেও অর্থাৎ সংসদীয় গণতন্ত্রে অনেক গণতান্ত্রিক উপাদান থাকলেও তা বুর্জোয়া ডিক্টেটরশিপ ছাড়া আর কিছুই নয়। তিনি ‘ক্লাস স্ট্রাগল ইন ফ্রান্স’-এ বার বার বুর্জোয়া শ্রেণিভুক্ত রাজনৈতিক নেতৃত্বের উদ্ধৃতি ব্যবহার করে দেখিয়েছেন যে, তাঁরা স্বীকার করছেন যে, অধিকাংশ জনগণের গণতান্ত্রিক সম্মতির উপর দাঁড়িয়ে তাঁরা যে ডিক্টেটরশিপ অর্জন করেছেন, জনগণের সম্মতির তোয়াক্কা না রেখেই সেই হেজিমনি রক্ষা করাই তাদের শ্রেণিগত দায়বদ্ধতা। ফ্রান্সে ১৮৪৮ সালে গণআন্দোলনের মাধ্যমে যে সাংবিধানিক প্রজাতন্ত্র গঠিত হয়েছিল তাও কার্যত বুর্জোয়া শ্রেণি সহ অন্যান্য শোষক শ্রেণির একনায়কত্বমূলক শাসন।

সর্বহারা শ্রেণির একনায়কত্ব বা গণতন্ত্রের ব্যাখ্যার এই ভূমিকা উপস্থাপনের প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে, যে কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টোতেই সর্বপ্রথম মার্কস-এঙ্গেলস তাদের যুগান্তকারী রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষের মুহূর্তে এই একনায়কত্বের মৌলিক ধারণা নির্মাণ করে দুনিয়ার মুক্তিকামী মানুষের কাছে বার্তা পাঠিয়েছেন।

রাষ্ট্র ও রাজনীতির শ্রেণিগত প্রেক্ষিতে নিপীড়ণ এবং কর্তৃত্বের শাসনে সমাজতান্ত্রিক সমাজেও কি বুর্জোয়া রাষ্ট্রের মতো নিপীড়ণ থাকবে, এই প্রশ্নটিই বার বার ফিরে ফিরে আসে। শ্রেণি অবলুপ্ত সমাজে প্রশাসন যারা পরিচালনা করবে তারা কিভাবে এই অভূতপূর্ব আপাত অলীক পরিকাঠামোটি নির্মাণ করে চিরসুন্দর শ্রেণিহীন সমাজের স্থায়িত্ব দেবে, সেই প্রশ্ন থেকেই যায়। আর যান্ত্রিক নির্ধারণবাদ এবং স্বেচ্ছাসেবিতামূলক নির্ধারণবাদ মুক্ত সামাজিক চেতনাসমৃদ্ধ এই প্রশ্নের অন্তর্নিহিত গতিময়তাই প্রশ্নের উত্তর সন্ধান করে দেবে ভবিষ্যতের ইতিহাস নির্দিষ্ট ঘটনার কালক্রমে।

আর ওয়াই এফ ও পি এস ইউ-এর আহ্বানে রাজভবন অভিযান

গত ১৪ ডিসেম্বর আর ওয়াই এফ ও পি এস ইউ-এর আহ্বানে রাজভবন অভিযান সংগঠিত হল। বর্তমান সময়ে কেন্দ্রও রাজ্য সরকারের ছাত্র-যুব বিরোধী নীতি সমূহের বিরুদ্ধে মূলত এই রাজভবন অভিযান ডাকা হয়েছিল। ছাত্র যুব নেতৃত্বের অভিযোগ, এই মুহূর্তে রাজ্যের সমস্ত দপ্তরের নিয়োগ নিয়ে ব্যাপক দুর্নীতি রাজ্যে বিশেষ মাত্রা পেয়েছে।

যোগ্য চাকরিপ্রার্থীরা চাকরির দাবিতে ধর্মতলায় দীর্ঘ প্রায় দু বছর যাবৎ রাত জাগছে। এক চরম অরাজকতা চলছে। কেন্দ্রের সরকারও রেল সহ সমস্ত ক্ষেত্রে স্থায়ী পদ বিলুপ্তকরণের কাজ করে চলেছে। চুক্তিভিত্তিক অতি অল্প সংখ্যক কর্মচারী নিয়োগ করে সরকার কর্মসংস্থানের দায় ঝেড়ে ফেলতে চাইছে। দেশজুড়ে ব্যাপক কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রগুলি ছিল রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাসমূহ। সেগুলি নির্বিচারে দেশি-বিদেশি কোম্পানির হাতে বেচে দিচ্ছে মোদী সরকার। এছাড়াও শিক্ষাক্ষেত্রগুলি সম্পূর্ণভাবে ব্যবসার জায়গায় পরিণত করার চেষ্টা করছে নয়া জাতীয় শিক্ষানীতি প্রয়োগের মাধ্যমে। মোদী সরকারের নয়া জাতীয় শিক্ষানীতিকে এ রাজ্যেও বাস্তবায়িত করার জন্য মমতা সরকারও পিপিপি মডেল চালু করার চক্রান্ত করছে। মমতা সরকার পূর্ণত কেন্দ্রীয় সরকারের আগ্রাসী অর্থনীতির অনুসারী।

সমস্ত শূন্য পদে দ্রুত স্বচ্ছ নিয়োগ, রেল সহ অন্যান্য ক্ষেত্রে পদ অবলুপ্ত না করা, রাজ্যে শিক্ষাক্ষেত্রে দুর্নীতিগ্রস্তদের অবিলম্বে শাস্তি, ১০০ দিনের কাজের বকেয়া টাকা অবিলম্বে দেওয়া, NEP ২০২০ বাতিল, শিক্ষাক্ষেত্র নিয়ে ব্যবসা বন্ধ করার দাবি সহ মোট ১২ দফা দাবি নিয়ে আর ওয়াই এফ ও পি এস ইউ রাজভবন অভিযান করে। অনেকদিন আগেই ২৮

নভেম্বর রাজ্যপালের কাছে দেখা করার সময় চাওয়া হলেও রাজ্যপাল ছাত্র-যুবদের সাথে দেখা করেননি। অবশেষে তাঁরা রাজ্যপাল দপ্তরের জয়েন্ট সেক্রেটারির কাছে তাঁদের দাবিপত্র তুলে দেন। ছাত্র যুব আন্দোলনের প্রতিনিধিরা রাজভবনেই প্রতিবাদ জানিয়ে বলেন, আপনারা সদিচ্ছা দেখালে রাজ্যপাল এই দাবিপত্র নিজেই গ্রহণ করতে পারতেন। রাজ্যপালের অনুপস্থিতিতে ছাত্র-যুব নেতৃত্ব দীর্ঘক্ষণ সমস্ত দাবি দাওয়া নিয়ে জয়েন্ট সেক্রেটারির সঙ্গে আলোচনা করেন। এদিনের রাজভবন অভিযানে মিছিলের মূল জমায়েত ছিল কলেজস্কোয়ারে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে। কয়েক হাজার ছাত্র-যুব হাজির ছিলেন এই মিছিলে। মূলত দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলি নিয়ে এই কর্মসূচি গৃহীত হলেও, উত্তরবঙ্গ থেকে নেতৃত্বরা ছাড়াও কর্মীদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। রাজভবন অভিযানকে উৎসাহ দিতে আর এস পি'র রাজ্য সম্পাদক কম. তপন হোড় ও দলের সাধারণ সম্পাদক কম. মনোজ ভট্টাচার্য উপস্থিত ছিলেন।

মুর্শিদাবাদ, দক্ষিণ ২৪ পরগণা ও নদীয়ার কর্মীরা শিয়ালদহ স্টেশন থেকে কম. আদিত্য জোতদার, কম. কৌশিক ভৌমিক, কম. হবিবুর রহমানের নেতৃত্বে সুবিশাল মিছিল সহ কলেজ স্কোয়ারে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে পৌঁছান। এখানে একটি ছোট সভার শেষে রাজভবনের উদ্দেশ্যে রওনা দেয় বর্ণাঢ্য ও সুবিশাল মিছিল। এই সভায় সভাপতিত্ব করেন আর ওয়াই এফ-এর রাজ্য সভাপতি কম. সব্যসাচী ভট্টাচার্য। এই সভা থেকে পি এস ইউ রাজ্য সম্পাদক কৌশিক ভৌমিক কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের শিক্ষা নীতি প্রসঙ্গে তীব্র সমালোচনা করেন। এই মিছিল নিয়ে উপস্থিত ছাত্র-যুবদের মধ্যে এমনকি পথ চলতি সাধারণ মানুষের মধ্যে উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো। কম. আদিত্য জোতদার, কম. সব্যসাচী ভট্টাচার্য, কম. কৌশিক ভৌমিক, কম. হবিবুর রহমানদের নেতৃত্বে এই মিছিল সংগঠিত হলেও মিছিলের পুরোভাগে ছিলেন আর ওয়াই এফের সাধারণ সম্পাদক কম. রাজীব ব্যানার্জী ও পি এস ইউ'র সাধারণ সম্পাদক কম. নওফেল মোহাঃ সফিউল্লা। মিছিল কলেজ স্কোয়ার থেকে এস এন ব্যানার্জী রোড হয়ে রানী রাসমণি রোডে পৌঁছালে পুলিশ সেই মিছিল ব্যারিকেড দিয়ে আটকে দেয়। এই ব্যারিকেড দেখে মিছিলে উপস্থিত ছাত্র-যুব কর্মীদের ব্যাপক ক্ষোভের সঞ্চার হয় যা পুলিশের ব্যারিকেডের উপর আছড়ে পড়ে। পুলিশ ও কর্মীদের মধ্যে খণ্ড যুদ্ধ বাঁধলেও উপস্থিত নেতৃবৃন্দ তা নিয়ন্ত্রণ করেন। মিছিলের পক্ষ থেকে ছয় জন ছাত্র-যুব নেতৃত্ব রাজভবনে তাঁদের দাবিপত্র পেশ করতে যান। সেই সময়কালে রানী রাসমণি রোডেই বিক্ষোভ চলতে থাকে। রাজ্যপাল নিজে দেখা না করায় সভাস্থলেই টায়ার জ্বালিয়ে ব্যাপক বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়। কম. রাজীব ব্যানার্জী বলেন, ''যতক্ষণ না পর্যন্ত স্বচ্ছ নিয়োগ না হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের এই লড়াই চলবে।'' পি এস ইউ সাধারণ সম্পাদক কম. মহঃ নওফেল সফিউল্লা বলেন, ''শিক্ষাকে কেন্দ্র ও রাজ্যের সরকার লাগাতার পণ্যে পরিণত করতে চাইছে। তাই কেন্দ্র NEP ২০২০ ও রাজ্য শিক্ষাক্ষেত্রে পিপিপি মডেল লাগু করার চক্রান্ত করছে।''

রাজ্যপাল নিজ হাতে দাবিপত্র না নেওয়ায় আর এস পি রাজ্য সম্পাদক কম. তপন হোড় তীব্র প্রতিবাদ জানান এবং সংবাদ মাধ্যমের কাছে বলেন যে ''ছাত্র-যুবদের প্রতি রাজ্যপাল চরম অনৈতিক আচরণ করছেন।'' কম. আদিত্য জোতদার বলেন যে, ''কেন্দ্র ও রাজ্যের সরকার দেশের ও রাজ্যের ছাত্র-যুবদের ওপর সবচেয়ে বেশি আঘাত নামিয়ে এনেছে, কর্মসংস্থান ও শিক্ষা নিয়ে ব্যবসা শুরু করেছেন''। এই সভা থেকে আগামীদিনে আরও বড় আন্দোলন ও প্রতিরোধের ডাক দেন তিনি। পি এস ইউ'র রাজ্য সম্পাদক কম. কৌশিক ভৌমিক বলেন যে, পশ্চিমবঙ্গের প্রায় সবকয়টি বিশ্ববিদ্যালয় এবং সবধরনের কলেজগুলিতে শিক্ষার পরিবেশই ধ্বংসপ্রাপ্ত। এই রাজ্যের শিক্ষাক্ষেত্রগুলিতে সামান্যতম গণতন্ত্রও নেই। দুর্বার আন্দোলনের মাধ্যমে এমন অবস্থার অবসান ঘটাতে হবে।

পশ্চিমবঙ্গে দুর্নীতি ও অরাজকতা চরমসীমায়

১-এর পাতার পর—

সরকারের পোষা লুম্পেনবাহিনী পুলিশ বা সাধারণ প্রশাসনের প্রত্যক্ষ প্রশ্রয়ে বামকর্মীদের অবদমিত করার কুকর্ম করেই চলেছে। তৃণমূলীরা রাজ্যের সামাজিক ভারসাম্য ধ্বংস করে এক চূড়ান্ত সন্ত্রাসের পথ ধরেছে।

রাজ্যের শিক্ষাক্ষেত্রে নিয়োগ দুর্নীতি যত বীভৎস আকারেরই হোক না কেন, এ-তো হিমশৈলের চূড়া ছাড়া কিছু নয়। দুর্নীতি তৃণমূলীদের কাছে জলভাত। সমস্ত ক্ষেত্রেই এমন দুর্নীতির ব্যাপক বিস্তৃতি। এই দলটির প্রায় কোনো নেতা কর্মীই এই অপকর্ম থেকে মুক্ত রয়েছেন বলে বোধ হয় না। সকলেই কোনো না কোনোভাবে আখের গুছিয়ে নিচ্ছেন। এই তো মওকা! এ রাজ্যে তো আর তেমন কোনো জীবিকার ব্যবস্থা হবে না। শিল্পপতিদের নিয়ে নাচাগানা আর বিনিয়োগের আশ্বাস দিয়ে চললেও, রাজ্যের সাধারণ মানুষের অঢেল টাকা অকাতরে ব্যয় হলেও কোনো শিল্প কারখানাই হবে না। অতএব সাধ্যমতো লুটে পুটে খাওয়াই একমাত্র পথ।

পশ্চিমবঙ্গে আর্থ সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিসরে প্রতিদিন নতুন নতুন নীতিহীনতার বিস্ফারণ এখন সাধারণ বিষয়। হাজার হাজার যোগ্য শিক্ষক পদপ্রার্থী পথে বসে রয়েছেন। শিক্ষাকর্মী বা গ্রুপ 'সি', গ্রুপ 'ডি'র বা পরীক্ষা উত্তীর্ণ যুবক যুবতীদের বঞ্চিত করে লক্ষ লক্ষ টাকার বিনিময়ে অনৈতিক নিয়োগ হয়েছে শাসক দলের ছোট মেজো ও বড় নেতাদের গভীর দুর্নীতির মাধ্যমে। অন্যদিকে রাজ্যের শীর্ষ আদালতের নির্দেশগুলিকেও উচ্চপদস্থ সরকারী কুশীলবরা কটাক্ষ করে চলেছেন। সি বি আই, ইডি প্রভৃতি কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাগুলির গতিবেগ কমিয়ে দিতে প্রধানমন্ত্রী বা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সহায়। সেটিং চলেছে বিশেষ বিশেষ সময়ে।

সারদা নারদা প্রভৃতি কেলেঙ্কারির স্বরূপ উন্মোচনে সি বি আই তদন্ত এখন গভীর শীতঘুমে। সুপ্রিম কোর্ট নির্দেশিত তদন্ত শুধুমাত্র সেটিং-এর জেরে স্তব্ধ হয়ে পড়েছে, কোনো সাড়া শব্দই আর শোনা যায় না। হয়তো একসময় হতাশ ক্ষতিগ্রস্তরা সবকিছুই ভুলে যেতে বাধ্য হবেন। মমতা ব্যানার্জীর সেই ঐতিহাসিক উক্তি 'যা গেছে তা গেছে' বাস্তব সত্য হয়ে পড়বে।

ইদানীং নতুন করে রাজ্যের প্রায় সর্বত্র প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার ঘর পাওয়া নিয়ে পাহাড় প্রমাণ দুর্নীতি প্রকাশ্যে এসে পড়েছে। সর্বত্র হতদরিদ্র মানুষদের ন্যায্য দাবি উপেক্ষা করে তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা নেত্রী বা তাদের আত্মীয় স্বজনদের অনৈতিকভাবে সুবিধা পাইয়ে দেওয়া হয়েছে বা হচ্ছে। এ বিষয়ে আশা কর্মীদের সমীক্ষা পর্যন্ত করতে দেওয়া হচ্ছে না। তৃণমূল আশ্রিত গুণ্ডা বদমাইশরা নিরীহ আশা কর্মীদের তটস্থ করে বাস্তব সত্য গোপনের অপচেষ্টা চালাচ্ছে। একজন আশা কর্মী তো বাধ্য হয়ে আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছেন। গ্রামে গ্রামে মানুষ প্রতিবাদ মুখর। পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে ত্রস্ত শাসকদল।

এমন এক কঠিন সংকট থেকে পরিত্রাণ পেতে দরিদ্র বঞ্চিত মানুষের দুর্বার জোট গড়ে উঠছে। বামপন্থী গণতান্ত্রিক প্রতিবাদী আন্দোলন বাঁধ ভেঙে আছড়ে পড়ছে। মানুষ আবার দলে দলে বামপন্থী আন্দোলনে যুক্ত হচ্ছেন। সবকটি বামপন্থী দলকে আরও সচেতনভাবে এমন অরাজকতার প্রতিবাদে পথের আন্দোলনে সামিল হতেই হবে। মানুষের দুর্ভেদ্য ঐক্য গড়েই শাসকদলের চরম অপরাধমূলক অবস্থানের অবসান ঘটাতে হবে।

পুঁজিবাদ প্রায় মৃত — একমাত্র বিকল্প সমাজতন্ত্র

মনোজ ভট্টাচার্য

বিগত বেশ কিছুকাল যাবৎ বিশ্বের নানা দেশে যে প্রবল দক্ষিণপন্থী স্বৈরতান্ত্রিক শাসকদের অভ্যুত্থান ঘটে চলেছে সে প্রসঙ্গে কোনো সন্দেহ নেই। ইদানীংকালে অবশ্য লক্ষ করা যাচ্ছে যে, সেই ঝোঁক কিঞ্চিৎ স্তিমিত বা থমকে পড়েছে। কোনো কোনো দেশে উদার বামপন্থীরা রাষ্ট্রপরিচালনার দায়িত্ব পাচ্ছেন। বিশেষ করে, লাতিন আমেরিকার অনেক দেশেই বামপন্থীদের উত্থান লক্ষণীয়। মনে রাখা ভাল, অতি দক্ষিণপন্থীরা বা বামপন্থীরা সকলেই তাদের দেশের সংবিধান বা নির্বাচনী বিধি মেনেই চলছেন। ব্যতিক্রমী কোনোকিছুর হদিশ পাওয়া যাচ্ছে না। সেই সব দেশের সাধারণ মানুষ হয়তো কিছুটা স্বস্তি পাচ্ছেন। অতি দক্ষিণপন্থী শক্তিগুলি যেভাবে মানুষের অধিকার কেড়ে নেয় এবং প্রতিবাদী মানুষদের পিষে মারার ব্যবস্থা করে, বামপন্থীরা শান্তিপূর্ণ প্রক্রিয়ায় সে পথে এলে অন্তত একই রকম পথে চলবেন না।

যা আমাদের ভাবায় তা হল, বাম ডান যে কোনো ধরনের রাজনৈতিক শক্তি রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব প্রাপ্ত হলেও প্রধান অর্থনৈতিক শক্তি অর্থাৎ পুঁজির কারবারীদের কোনো ইতর বিশেষ হয় কী? তাদের অর্থাৎ পুঁজি মালিকদের শোষণের তীব্রতা কিছুটা কমালেও মোট মুনাফা তেমনভাবে কমে না। কমলেও তা অন্যভাবে পুষিয়ে নেবার ব্যবস্থাও থাকে। তার মানে দেশে দেশে বা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে পুঁজিবাদী আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার তেমন কোনো তাৎপর্যবাহী পরিবর্তন হয় না বললেই চলে। পুঁজিবাদ তো আর একমাত্রিক পথেই চলে না। এর জাল এমন গোপনে গভীর অন্ধকার সৃষ্টি করে চলে যে, শুধুমাত্র সাধারণ কেন অনেক বামপন্থী সচেতন মানুষও প্রাথমিক অবস্থায় পুঁজির গভীর ষড়যন্ত্র টের পান না। যখন সত্যিই উপলব্ধি করেন তখন তাঁরা নিরুপায়, নিঃসহায়। একসময়ের সামান্য আপস শেষ পর্যন্ত মৃত্যুশেল হয়ে বুকে বাজে।

অতীতের মহামন্দা কি এখনও প্রবহমান

এমন অতি সরলীগৃত ব্যাখ্যা সঠিক নয় বলেই বোধ হয়। ১৯২৯-৩৯ সাল পর্যন্ত যে মহামন্দা, যার সমাধান সূত্র খুঁজতে এক ভয়াবহতম দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আয়োজন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের (১৯১৪-১৯১৮) করলে কয়েক কোটি মানুষের নৃশংস হত্যা এবং বহু জনপদ নির্বিচারে ধ্বংস করেও পুঁজিব্যবস্থার অমোঘ সংকট থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায়নি। অনেকক্ষেত্রে জটিলতর হয়েছে। বিবদমান দেশগুলির মধ্যে যেসব চুক্তি মারফৎ সন্ধি স্থাপিত হয়েছিল, সেগুলি বাস্তবে প্রবলতর জাতীয়তাবাদের উদ্রেক ঘটিয়ে নৃশংসতর মারণ যুদ্ধের প্রস্তুতি ত্বরান্বিত করে। শান্তিচুক্তিগুলি অনেক ক্ষেত্রে বিদ্যমান পুঁজিবাদী সংকটকে গভীরতর হতে সহায়ক হয়েছিল। এ প্রসঙ্গে সম্ভবত দুনিয়াজুড়ে বিরাজিত পণ্ডিতমনস্ক মানুষদের মধ্যে তেমন মতভেদ নেই।

বাস্তবে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সশব্দ দামামার উদ্বেল আওয়াজকে সমাজ পরিবর্তনের সুযোগ বলে চিহ্নিত করেছিলেন এক প্রকৃষ্ট দার্শনিক, মার্কসবাদের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে অনন্য যোগ্যতার অধিকারী জননেতা ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিন। তিনি ঐতিহাসিক উচ্চারণে বলেছিলেন পুঁজিবাদের সংকটকাল মানে জনগণের উৎসব। শুধুমাত্র বলেননি, তিনি তাঁর বলশেভিক পার্টির সকল নেতাদের প্রাঞ্জল ভাবে ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁর কথার সারমর্ম অনুরণিত হয়েছিল সেই সময়ের রুশ দেশের শ্রমিক শ্রেণির অন্তরে।

১৯০৫-০৬ সালের প্রথম গণতান্ত্রিক বিপ্লব প্রচেষ্টা পূর্ণতা পায়নি। কিন্তু তৎকালীন রুশ সম্রাট জার নিকোলাস-২ স্টলিপিনকে নিযুক্ত করে কমিশন করে দেন। সেই কৃষি কমিশনের পরামর্শ মেনে রাশিয়ার বিস্তীর্ণ কৃষিক্ষেত্রে বেশকিছু তাৎপর্যপূর্ণ সংস্কারও হয়। এসবের পরেও ১৯১৭ সালে কৃষক সম্প্রদায়কে শ্রমিক শ্রেণি থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখা সম্ভব হয়নি। অত্যাচারী জার প্রশাসন দুর্বল হলেও রুশদেশের পুঁজিবাদী শোষণে শ্রমিকশ্রেণির মতো কৃষক সমাজও অস্থির হয়ে উঠছিল।

মহাবিপ্লব সংঘটিত হয়েছিল রুশ দেশে। দুনিয়া কাঁপানো সেই বিপ্লবী কর্মকাণ্ড সমগ্র বিশ্বের পুঁজিবাদী ব্যবস্থার ভিতে কম্পন ধরিয়েছিল। সত্যিকারের ইতিহাসে দেখা যায় রুশ দেশের মানুষ লেনিন কথিত উৎসবে মত্ত হয়েছেন। সে উৎসব মুক্তির, শোষণ নিপীড়ন, অত্যাচারের শতাব্দীপ্রাচীন ঔদ্ধত্য থেকে মুক্তি। পুঁজিবাদের শিকল থেকে মুক্তি। লেনিনের নেতৃত্বে রুশ জাতীয়তাবাদের জড় পর্যন্ত উপরে ফেলে রাশিয়া নামটাই উবে যায়। প্রতিষ্ঠা পায় সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েতগুলির সম্মিলিত গণরাজ্য। এই মহান ইতিহাস প্রতিনিয়ত স্মরণে রাখার বিষয়, চর্চার বিষয়। এই ঘটনার মাধ্যমে বিশ্বে প্রথম শ্রমিক শ্রেণি পরিচালিত রাষ্ট্র গড়ে ওঠে।

॥ ২ ॥

অস্তিত্ব বাঁচিয়ে রাখতে পুঁজিবাদের আধুনিকীকরণ হয়েছে অবিরাম। বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ কিংবা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকেই প্রযুক্তি উন্নয়নের ধুম পড়ে যায় মুখ্যত পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অমোঘ সংকট থেকে পরিত্রাণের লক্ষ্যে। ব্যক্তিপুঁজির উদার বদান্যতা ও তাদের রাষ্ট্রের সহায়তায় পুঁজি-উন্নত দেশগুলির গবেষণাগারে নিরন্তর প্রচেষ্টায় তাৎপর্যবাহী প্রযুক্তি উন্নয়ন সম্ভব হয়ে ওঠে। সেই উন্নয়ন এক জায়গায় স্থানুবৎ হয়নি। ক্রমাগত আরও উদ্‌গত হয়েই চলেছে। বস্তুত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসান পরবর্তীকালে জনগণের বিপ্লবের পরিবর্তে প্রযুক্তি বিপ্লব সংঘটিত হয়ে চলে। উদ্ভাবিত নতুন নতুন প্রযুক্তি দেশীয় বৈশিষ্ট্যগুলি উপেক্ষা করেই দেশে দেশে চালান হয়ে চলে। ঊনবিংশ শতাব্দী বা বিংশ শতকের প্রথমভাগে বিজ্ঞানের উৎকর্ষ সাধনে যে নিবিড় প্রচেষ্টা এবং ফললাভ হয়েছিল তার ধারা কিছুটা স্তিমিত হয়ে প্রযুক্তির উন্নয়নের পর্যবসিত হয়। প্রযুক্তিকে পণ্য হিসেবে বেশ চড়া দরে বাজারজাত করার অদম্য প্রচেষ্টার মাধ্যমে নিত্যনতুন বাজারের সন্ধান চলে। নানাদেশের শাসনব্যবস্থাগুলিও এদিকেই ঝুঁকে পড়ে। ফলত, পুঁজিবাদের পণ্যবিপণনের পথও সুগম হয়ে চলে।

বেশ কিছুকাল প্রযুক্তি বিপ্লবের অমৃতসম ফলাফল দিকবিদিক প্রকম্পিত করা বিজ্ঞাপনের আড়ালে পুঁজিবাদী আর্থ সামাজিক সংকটের স্বরূপ গোপন করা আপাতভাবে সম্ভব হয়। উল্লেখ করতেই হয় যে, প্রযুক্তির প্রবর্তন শুধুমাত্র কোনো নির্দিষ্ট দেশের সীমার মধ্যেই আবদ্ধ থাকেনি। বিশেষ করে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং তার সহগামী দেশগুলির বিপুলাকার বহুজাতিক ব্যবসায়ীদের মুনাফা আরও দুরন্ত গতিতে বাড়িয়ে চলার জন্য উন্নত প্রযুক্তির যুদ্ধাস্ত্র নির্মাণেও উৎসাহ দেওয়া চলতে থাকে। ইউরোপ বা আমেরিকার ভূখণ্ডে নয়, এবার আলোড়িত হতে থাকে এশিয় ভূখণ্ড। প্রথম বা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে এশিয়ার দেশগুলি দেশ প্রত্যক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি, সেসব দেশের ওপর নানা অছিলায় সাম্রাজ্যবাদী পুঁজির মুরুব্বিরা যুদ্ধ সন্ত্রাস নামিয়ে আনে। ধ্বংসলীলা চলে নির্বিচারে। অস্ত্র ব্যবসায়ীদের মদত দিয়ে প্রভূত মুনাফা সংগ্রহের ব্যবস্থা করতে থাকে পুঁজি উন্নত দেশগুলির প্রশাসন। এ এক বিস্তারিত আখ্যান, যার কোনো সংক্ষিপ্ত বিবরণ সম্ভব নয়।

বিশ্বপুঁজিবাদ একদিকে নতুন নতুন প্রযুক্তির উদ্ভাবন-বিপণন এবং অনেকক্ষেত্রে চাপিয়ে দেবার ব্যবস্থা যেমন করে, তেমনভাবেই আর্থ-রাজনীতির ক্ষেত্রে নতুন এক আকার দিতে থাকে নয়া উদারবাদের নামে। বিগত শতাব্দীর সত্তরের দশক থেকেই এই সর্বব্যাপ্ত আর্থ সামাজিক প্রকল্পগুলির প্রসার শুরু। একথা মনে করা আদৌ সমীচীন নয় যে, নয়া উদারবাদী প্রকল্পগুলি শুধুই অর্থনৈতিক। বরঞ্চ বলা চলে যে, সাধারণ মানুষের চিন্তাভাবনা, সংস্কৃতিবোধ, জীবনবোধ পর্যন্ত আচ্ছন্ন করে এক যান্ত্রিক মনুষ্যত্ব নির্মাণের এক প্রকৌশল। মানবজীবনের সর্বক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করে চলে।

নয়া উদারবাদ অপেক্ষা অন্য কোনো নিষ্ঠুরতর ব্যবস্থা ইতিহাসে দেখা যায় না। কিন্তু এমন সুচারু ভাবে তা প্রযুক্ত হতে থাকে যে, এর বিরুদ্ধে গণপ্রতিবাদ বা প্রতিরোধ গড়ে ওঠাও কঠিন হয়ে পড়ে। এর ভাবধারায় মানুষকে আবিষ্ট করে ফেলা হয়। নিত্যনতুন চাহিদা সৃষ্টি এবং তা পূরণের সহজ কিন্তু ব্যয়সাপেক্ষ ব্যবস্থা মানুষের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হতে থাকে। প্রথমদিকের যে প্রতিরোধী মনোভাব তা, ধীরে ধীরে কমতে থাকে এবং অবশেষে তা গ্রহণের পক্ষে যুক্তি নির্মিত হয় অবিরত।

সবকিছুরই মূল উদ্দেশ্য পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অমোঘ সংকট থেকে মানুষের দৃষ্টি সরিয়ে রাখা। সংকট তো পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অন্তর্নিহিত স্বাভাবিক সমস্যা। এই বাস্তবতা প্রকাশ্যে এসে গেলে মানুষ সরাসরি পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে চ্যালেঞ্জ করতে পারে। ব্যবস্থাকে ধ্বংস করে উন্নততর ব্যবস্থার দিকে ধাবিত হতে পারে। সুতরাং পুঁজিতান্ত্রিক বিশ্বের মুরুব্বিদের কাছে এ এক বিষম দায়। যে করেই হোক, পৃথিবীর সাধারণ লোকসমাজকে বিভ্রান্ত করে রাখতে হবে। সোজা পথে না সম্ভব হয়ে বজ্রমুষ্টি প্রয়োগ করা হবে। যুদ্ধ চাপিয়ে দেওয়া হবে মানুষকে ভীত সন্ত্রস্ত করতে। জোর করে নয়াউদারবাদের বিষবটিকা গলধঃকরণে বাধ্য করা হবে।

॥ ৩ ॥

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসান পরবর্তীকালে লক্ষ করা যায় যে, ইউরোপ মহাদেশের বিপুল অংশ নিতান্ত ধ্বংসস্তূপে পরিণত। যুগোশ্লাভিয়া ব্যতীত একাংশে পটস্‌ডাম, ইয়ালটা বা তেহরান চুক্তি অনুযায়ী সোভিয়েত ইউনিয়ন অনুগত অপুঁজিবাদী আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা বলবৎ হয়। হিটলারের মুখ্য বিচরণভূমি জার্মানী দু'ভাবে বিভক্ত। ওই দেশের লোক সাধারণের কোনো মতামতের পরোয়া বা তোয়াক্কা না করেই প্রাচীর তুলে একাংশের মানুষকে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় আটক রেখে অন্য অংশে অধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা বলবৎ হয়। অনেকে এসব মহাপরাক্রমশালী দেশগুলিকে সোভিয়েত ইউনিয়নের আওতাধীন সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা বলেও অভিহিত করেন। এমন সংজ্ঞার অবশ্যই কোনো মার্কসীয় যুক্তি খুঁজে পাওয়া ভার। যাই হোক্, ইউরোপের অনেকগুলি দেশকে ধনতান্ত্রিক পথে পুনর্গঠন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিশেষ মাথা ব্যথার কারণ হয়ে পড়েছিল। সকলেই জানেন যে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসান হবার পরেই বিশ্বপুঁজিবাদের সদর কেন্দ্র মহা ব্রিটেন থেকে ওয়াশিংটনে স্থানান্তরিত হয়। পুঁজিবাদী ব্যবস্থার সর্বাঙ্গীন দেখভালের পবিত্র দায়িত্ব বলে কথা!

প্রথমেই ওই রাষ্ট্রের শক্তিমদমত্ততার প্রমাণ দিতে ১৯৪৫-এর ৩১ জুলাই মোটামুটি যুদ্ধ অবসানের পর মার্কিন রাষ্ট্রপতি হ্যারি ট্রুম্যানের চূড়ান্ত অমানবিক সিদ্ধান্তে ৬ আগস্ট হিরোশিমা এবং ৯ আগস্ট নাগাসাকির মতো জনাকীর্ণ শহর দুটির ওপর আণবিক বোমা বর্ষণ করে মানবেতিহাসে ন্যক্কারজনক উদাহরণ সৃষ্টি করা হল। লক্ষ লক্ষ মানুষের মৃত্যু এবং দুটি শহরের পূর্ণ বিপর্যয়ের মাধ্যমে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নৃশংস আধিপত্যবাদী মানসিকতার পরিচয় মেলে। মানববিশ্ব স্তম্ভিত হতচকিত। মার্কিন মুলুকের দৌরাত্ম্য বিপুলবেগে বিশ্বজনমতের কাছে এক বিভীষিকার উদ্ভব ঘটায়। কোনো কোনো ইতিহাসকার অবশ্য মন্তব্য করেন যে, হ্যারি ট্রুম্যান নাকি যুদ্ধকালীন মিত্রশক্তির অপর দুই স্তম্ভ উইনস্টন চার্চিল এবং জোসেফ স্তালিনকে জানিয়েছিলেন যে, মানব অস্তিত্ব সমূলে ধ্বংস করার আয়ুধ বা মহাঅস্ত্র ম্যানহাট্টান প্রকল্প নির্মাণ করে ফেলেছে এবং তার পরীক্ষামূলক ব্যবহার পীতবর্ণের মানুষদের দেশ জাপানের ওপর করা হবে। এর সত্যতা নিশ্চিতভাবে নিরূপণ করা বাস্তবে কঠিন।

॥ ৪ ॥

মার্কিন সাম্রাজ্যিক শক্তি ১৯৪৫ এ মানবিক অস্তিত্ব পর্যন্ত বিপর্যস্ত করার অপকর্ম করে সমগ্র বিশ্বের স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র প্রিয় মানুষদের রক্তচক্ষু প্রদর্শন করে পুঁজিবাদের সংকীর্ণ স্বার্থ রক্ষার কাজে সামিল হয়। তিন দেশীয় নেতাদের প্রীতির সম্পর্ক অল্পকালের মধ্যেই অবসিত হয়। ব্রিটেন ও আমেরিকা সর্বতো পথে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরোধিতায় উদ্গ্রীব হয়ে উঠতে পারে সে চিন্তায় অধীর হয়ে ওঠে। পুঁজিবাদ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে সমাজবাদের দীর্ঘকালীন শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের অলীক তত্ত্ব অল্পকালের মধ্যেই ফুটো ফানুসের মতো ভূপতিত হয়। সোভিয়েতের উদ্যোগে ওয়ারশ প্যাক্ট বাস্তবায়িত হতে থাকে। মার্কিন নেতৃত্বে ন্যাটো ও সিয়াটোর পরিবর্ত নির্মাণের উদ্যোগ। একে অন্যের বিরুদ্ধে অলিখিত যুদ্ধের ধমকও দিতে থাকে। ঠাণ্ডা যুদ্ধের কাল শুরু হয়ে যায়।

অন্যদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উদ্যোগে ওয়াশিংটন কনসেনশাস বা ঐকমত্য নামে এক বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বৈশ্বিক ব্যবস্থা গড়ে ওঠে। ১৯৪৮ সালে এই ধরনের একটি পরিকল্পনা মারফৎ IBRD বা International Bank for Reconstruction and Development তৈরি করে যুদ্ধবিধ্বস্ত ইউরোপের বিধ্বস্ত অর্থনৈতিক অবস্থা থেকে উত্তরণের ব্যবস্থা নির্মিত হয়। অল্পকিছুকাল পরেই এমন ঐকমত্য অনুযায়ী আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার বা IMF নামে আরও একটি শর্তসাপেক্ষে ঋণদানকারী সংস্থা গড়ে ওঠে। IBRD সম্পর্কে তৃতীয় বিশ্বের অনেক অর্থনীতি শাস্ত্রী বলেছিলেন যে, এটি আসলে International Bank for Recession and Destruction অর্থাৎ দেশে দেশে মন্দা সৃষ্টি করা এবং অর্থনীতির ধ্বংস সাধন করাই এই সংস্থাটির প্রকৃত উদ্দেশ্য। পরবর্তীকালে এর নাম হয় বিশ্বব্যাংক।

এই ক্ষুদ্র নিবন্ধের আলোচনায় সবকিছু সন্নিবেশিত করা সম্ভব নয়। শুধুমাত্র উল্লেখ করতেই হয় যে, এইসব সংস্থাগুলি নয়া উদারবাদী প্রস্তাবনাগুলিকে বিশ্বের নানা দেশে প্রয়োজনে সমরাস্ত্র প্রয়োগে বা রেজিম চেঞ্জ করে প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে উল্লিখিত সাম্রাজ্যবাদী পুঁজি বা লগ্নিপুঁজির স্বার্থবাহী সংস্থা হিসেবে কাজ করে গেছে। তৃতীয় বিশ্ব, যেসব দেশগুলিকে সোহাগ করে উন্নয়নশীল বলা হয় তাও কিন্তু আগ্রাসী পুঁজির স্বার্থপূরণ করতে ওইসব দেশগুলিকে যুক্ত করার কৌশল ভিন্ন আর কিছু নয়। বাস্তব বিচারে পুঁজিবাদের মহামন্দা বা গভীর সংকট এখনও তীব্রভাবে প্রবহমান। অনেক ফন্দিফিকির করেও তা গোপন রাখা আর সম্ভব নয়। মৃত এবং পরিত্যক্ত একটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে কোরামিন জাতীয় ওষুধ প্রয়োগ করে জীবিত বলে প্রচার করা হচ্ছে।

এমন এক জীর্ণ ব্যবস্থাকে ভারতের মতো এক বিপুল জনসংখ্যার দেশে ছলে বলে কৌশলে বাস্তবায়িত করার উন্মত্ত প্রচেষ্টা চলছে। বর্তমান কালে নরেন্দ্র মোদী সরকার আন্তর্জাতিক লগ্নিপুঁজির সংকীর্ণ স্বার্থেই নানা কৌশল করে চলেছে।

শুধু দুর্নীতি নয়, মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে পঞ্চায়েত নির্বাচনে লড়তে হবে

পঞ্চায়েতের ভোট সম্ভবত আগামী বছরের মার্চ-এপ্রিলের মধ্যেই ঘোষিত হবে, এ ধরনের সংবাদই আশা করছেন রাজ্যবাসী। ভোট তো কয়েকটা দিনের ভোট দান শুধু নয়, আসলে ভোটের রাজনৈতিক দলগুলি, অবশ্যই মিডিয়া প্রচার শুরু করে দিয়েছে ২০২২ সালের শুরু থেকেই। একটা বিষয় পরিষ্কার যে আমাদের রাজ্যে পঞ্চায়েতকে ঘিরে যে রাজনীতি এবং অর্থনীতি গড়ে উঠেছে, তা রাজ্যে শাসনক্ষমতা দখল করা শুধু নয়, ধরে রাখা এবং বিভিন্ন জেলা থেকে শুরু করে ন্যূনতম গ্রামসংসদ স্তরে ক্ষমতার সুনির্দিষ্ট ভিত্তি এবং সূচক স্পষ্ট করে দেয়। আসলে বামফ্রন্ট সরকার ১৯৭৭-৭৮ সালে এবং পরবর্তীতে কেন্দ্রীয় সরকার বামফ্রন্ট সরকারের মডেল অনুসরণ করে তৃণমূল স্তরে গণতন্ত্র বিকাশের যে রূপরেখা তৈরি করেছিল, তা গত শতাব্দীর নব্বই এর দশক থেকেই বিলীয়মান হতে হতে, ক্ষমতা, অর্থ উপার্জনের উপায় ও রাজনীতি প্রভাবিত দুর্বৃত্ততন্ত্র দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়ে গিয়েছে।

যথারীতি এবারও পঞ্চায়েত ভোটের দিন যত এগিয়ে আসছে। ততই হিংসাত্মক ঘটনা, বোমা, পিস্তল উদ্ধার, এখানে ওখানে হাতে বানানো বোমা লুকিয়ে রাখা এবং বল ভেবে খেলতে গিয়ে কয়েকটি শিশুর হতাহত হওয়ার ঘটনা ইত্যাদি দ্রুত বেড়ে যাচ্ছে। আর যেহেতু, রাজ্যের নীচু স্তর থেকে সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত রাজনীতির অলিন্দে দুটি দুর্বৃত্ত-প্রভাবিত ক্ষমতাশালী ব্যক্তি ও গোষ্ঠীদের দাপাদাপি, সুতরাং এরাজ্যে পঞ্চায়েত নির্বাচনে রাজ্য নির্বাচন কমিশনের ভূমিকায় যে কোনো মৌলিক পরিবর্তন দেখা যাবে না, সে সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ নেই। গত বছর প্রায় ৩৮ শতাংশ ত্রিস্তর পঞ্চায়েতে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তৃণমূল কংগ্রেস নির্বাচিত হতে পারে, বিভিন্ন কারণে সেই শতাংশ একটু কমতে পারে। বিশেষ করে অনুব্রত মণ্ডল ও তার মতো কয়েকজন তৃণমূল মাফিয়ার প্রত্যক্ষ অনুপস্থিতি থাকলেও, ক্ষমতার শূন্য স্থান দখল করার জন্য তাদের বিভিন্ন গোষ্ঠীর হিংসাত্মক কাজকর্ম ও প্রশাসনের তথা নির্বাচন কমিশনের নিষ্ক্রিয়তা যথারীতি বজায় থাকবে বলেই আশঙ্কা করা যাচ্ছে।

এদিকে তৃণমূলের বিকল্প হিসাবে বিজেপি'র পক্ষে প্রচারের উদ্যোগে অধিকাংশ বৈদ্যুতিন মাধ্যমের কোনো জুড়ি মেলা ভার। সমস্ত হিংসাত্মক ঘটনায় বিজেপি'র নেতৃত্ব যে সর্বদাই এন আই এ, সি বি আই তদন্তের দাবি করছে এ বিষয়টিও মিডিয়া উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে প্রচার করে যাচ্ছে। তবে একটি বিষয় সম্বন্ধে আশ্চর্যজনকভাবে মিডিয়া নীরব। বিগত পঞ্চায়েত এবং বিধানসভা নির্বাচনে বামপন্থীদের অবস্থান ঘুলিয়ে দিতে যেভাবে 'আগে রাম পরে বাম'-এর তত্ত্বের পক্ষে জানপ্রাণ দিয়ে জনসাধারণের মাথায় গেঁথে দেওয়ার কাজ চালিয়ে যাচ্ছিল সেই অবস্থান থেকে বামপন্থীদের, বিশেষ করে বাম ছাত্র যুব সংগঠন সমূহের মফস্বল ও গ্রামাঞ্চলের মানুষকে সঙ্গে নিয়ে আন্দোলনের তীব্রতা বৃদ্ধিকে অস্বীকার করতে না পেরে, অনেকটাই সরে এসেছে।

তথাপি তৃণমূল বনাম বিজেপি, রাজ্য পুলিশ আমলা বনাম সি বি আই-ইডি-কেন্দ্রীয় আমলা বাইনারি থেকে সরে আসার লক্ষণ দেখাচ্ছে না প্রিন্ট এবং বৈদ্যুতিন মাধ্যম। ২০১৮-র পঞ্চায়েত নির্বাচনে প্রতিষ্ঠান বিরোধী অর্থাৎ তৃণমূল কংগ্রেস বিরোধী ভোটের বিরাট অংশ বিজেপি'র বাক্সে গিয়ে পড়েছিল। অবশ্যই সেদিন বামপন্থীদের উপর অত্যাচার, নিপীড়ন অসংখ্য ভুয়ো মামলা চেপে বসেছিল। তাছাড়া তৃণমূল কংগ্রেসের তথাকথিত জনবাদী কর্মসূচি বিশেষভাবে কয়েকটি পরিচিতি সত্তাকে ওপর ওপর সরকারি গুরুত্ব দেওয়ায় একটা সাধারণ ঝোঁক তৃণমূলের দিকে তো ছিলই। বিপরীতে কেন্দ্রীয় ক্ষমতাশীল দলের হাতে অসীম ক্ষমতা এই ধরনের একটা বিশ্বাসে ভরসা করে তৃণমূলের বিক্ষুব্ধ দুর্বৃত্ত নেতাদের একাংশ বিজেপি'র সমর্থক-কর্মী এবং আপাতত অত্যাচারিত ও সশঙ্কিত ভোটারদের নিরাপত্তা রক্ষকের ভূমিকায় কিছুটা অবতীর্ণ হতে পেরেছিল। বামপন্থীরা যে কারণেই হোক সেদিন এই যুগ্ম শক্তির শ্রেণি চরিত্র তুলে ধরে আন্দোলনে সামিল হতে পারে নি। এমনকি কিছুটা গা বাঁচানোর জন্য ও ধৈর্য ধরে পরে দেখা যাবে বলে সরে থেকেছে। যথারীতি এর ফল শুধু পঞ্চায়েত ভোটে নয় ২০১৯-এর লোকসভা ভোটেও হাতে হাতে লাভ করেছে বিজেপি। ৪২টি লোকসভা আসনের মধ্যে থেকে ১৮টাই সেদিন ছিনিয়ে নিয়েছে বিজেপি। কোটি কোটি টাকা, সরকারি বিমানে নিত্যযাত্রী প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সহ গুচ্ছের নেতা নেত্রীদের প্রচার বিফলে যায়নি। আবার ২০২১ সালে জনসমর্থনের সন্ত্রাসের কাঁটা সেই কর্পোরেট অনুসারী বাইনারি নির্ভর সমর্থনের ঝোঁকটা অনেকটাই বিজেপি'র দিক থেকে টি এম সি'র দিকে সরে এল। ২৯৪টির মধ্যে ২১৫টি আসন তৃণমূল কংগ্রেসের আর ৭৫টি বিজেপি'র। বামফ্রন্ট ও কংগ্রেসের আসন সংখ্যা শূন্য। বামপন্থীদের ভোটও নেমে এল ভীষণভাবে। এর জন্য শুধু বামফ্রন্টই দায়ী নয়। বিজেপি'র কর্পোরেট ঘেঁষা আর্থিক নীতি, সংখ্যালঘুদের একঘরে করার এন আর সি, সি এ এ ইত্যাদির বিরুদ্ধে প্রধান বিরোধী শক্তি হয়ে দাঁড়ালো টি এম সি। শুধু তাই নয়, ব্রামফ্রন্টের বাইরের অন্যান্য বামপন্থী শক্তি, প্রাক্তন নক্সালবাদী দল সহ এস ইউ আই (সি) ও মমতার সপক্ষে প্রচার এই ভোটে তৃণমূলের হাত শক্ত করেছে। এরপরে ২০২২-এর পৌর নির্বাচনগুলিতে অধিকাংশ ক্ষেত্রে টি এম সি জয়ী হলেও, বিজেপি'র সমর্থন দ্রুত কমে এল। অধিকাংশ আসনে বামপন্থীরা কম ভোট পেলেও দ্বিতীয় স্থান অধিকার করতে সমর্থ হল। ইতিমধ্যে শিক্ষা স্বাস্থ্য পুলিশ প্রভৃতি দপ্তরে শিক্ষক, নার্স সহ বিভিন্ন দপ্তরে গ্রুপ সি এবং গ্রুপ ডি কর্মী নিয়োগে হাইকোর্টের এবং তাদের নির্দেশে সি বি আই-এর তদন্তে তৃণমূল কংগ্রেসের নেতৃত্বের পাহাড় প্রমাণ দুর্নীতি ধরা পড়ল। শুধু তাই নয় গরু পাচার কাণ্ডে অনুব্রত মণ্ডলের নেতৃত্বে যে ভয়ঙ্কর দুর্নীতির জাল বিস্তৃত হয়েছিল তাও জনসমক্ষে এলো। পাশাপাশি পঞ্চায়েতে সরকারি পরিষেবাগুলি যথা ১০০ দিনের কাজ থেকে শুরু করে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা ইত্যাদি পরিসরে একে একে তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বস্তরের দুর্নীতি ও দুর্বৃত্ততন্ত্রের ছবিটা স্পষ্ট হয়ে উঠল।

এইসব বিষয় সমূহকে সামনে রেখে বামপন্থীরা গ্রাম শহরে ব্যাপক আন্দোলনে সামিল হওয়া সত্ত্বেও অধিকাংশ প্রচার মাধ্যম দুর্নীতি বিরোধী লড়াই-এও বিজেপিকে প্রধান মুখ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার কাজে প্রাচর শুরু করেছে।

সীমাহীন বেকারত্ব, স্বাস্থ্য শিক্ষা বাসস্থানসহ সমস্ত পরিষেবার ক্ষেত্রে জনসাধারণের বঞ্চনা ক্রমশই বেড়ে যাচ্ছে। কেন্দ্র ও রাজ্য উভয় সরকারই নয়াউদার নীতির পথ ধরে শ্রমের বাজার সংকুচিত ও সস্তা করে চলেছে। করোনা পরবর্তী দুরবস্থা থেকে জনসাধারণ কিছুতেই মুক্ত হতে পারছে না। এদিকে প্রাকৃতিক ও রাষ্ট্রায়ত্ত সম্পদের উপর কর্পোরেটে দখলদারি বেড়ে যাচ্ছে। রাজ্য সরকার অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিকদের জন্য যে আলাদা আলাদা বোর্ড ছিল তাকে এক ছাতার তলায় এনে বাজেট বরাদ্দ ভীষণ কমিয়ে দিল। ওয়েলফেয়ার বোর্ডের টাকা অন্যান্য খাতে দান ধ্যান, মেলা ইত্যাদিতে ব্যয় করা শুরু করল বেপরোয়াভাবে। আশা, অঙ্গনওয়াড়ি, জনস্বাস্থ্যকর্মী, মিড-ডে মিল কর্মীরা তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত তো হলই, তাদের ওপর কাজের বোঝাও বেড়ে যেতে থাকে। অধিকাংশ দপ্তরে অস্থায়ী ও চুক্তিভিত্তিক কর্মী দিয়ে কাজ চালানো শুরু হল। এভাবে প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতি সারা রাজ্যে গেড়ে বসেছে। কৃষিজীবী সমাজ ক্রমশ গভীর সঙ্কটে বেঁচে যাবার পথ খুঁজে বেড়াচ্ছে। কৃষিজাত পণ্যের ন্যায্যমূল্য না পেয়ে বেসরকারি ক্ষুদ্র ঋণ ও সুদখোরদের ক্ষমতাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে। কর্মসংস্থানের পথ খুঁজে না পেয়ে যুব বয়সের গ্রামীণ শ্রমজীবী মানুষ বিভিন্ন রাজ্যে প্রবাসী হয়েছে। আর অনেকেই সৎভাবে জীবিকা অর্জনের পথ হারিয়ে দুটি দুর্নীতি প্রধান-দুষ্কৃতী অধ্যুষিত দলের নেতাদের দাসানুদাস হয়ে অপরাধমূলক কাজ বেছে নিয়েছে।

এই দুটি দলের অন্যায় অত্যাচার জনসাধারণের কাছে অস্পষ্ট করে দেওয়ার উদ্দেশ্যে তৃণমূল কংগ্রেস এবং বিজেপি পরিচিত সত্তার বিভেদমূলক রাজনীতি এবং পাশাপাশি জনপ্রিয়তাবাদী কিছু প্রকল্পের পথ বেছে নিয়েছে। ধীরে ধীরে এদের উস্কানিতে দলিত ওবিসিদের পরিচিত সত্তা, সাম্প্রদায়িক মেরুকরণকে আবার বাড়িয়ে তোলা হচ্ছে পঞ্চায়েত নির্বাচনের পরিপ্রেক্ষিতে। ইতিমধ্যে ওবিসির কুর্মী সম্প্রদায়, আদিবাসী জনগোষ্ঠীর তালিকাভুক্ত হওয়ার দাবিতে পথে নেমেছে। ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, মেদিনীপুরে এই পরিচিতি সত্তার আন্দোলনের আখের গোছাতে ব্যস্ত এই দুটি প্রতিক্রিয়াশীল দল। ইতিমধ্যে মমতা ব্যানার্জীর সরকার সাঁওতাল, লোধা আর কুর্মীদের জন্য পৃথক পৃথক ওয়েলফেয়ার বোর্ড গঠন করেছে। ঝাড়গ্রামকে পশ্চিম মেদিনীপুর থেকে পৃথক করা হয়েছে। আবার অমুসলিম মতুয়া গোষ্ঠীকে নাগরিকত্ব দেওয়ার নামে বিজেপি এন আর সি ও সি এ এ চালু করার পক্ষে প্রচার শুরু করেছে। বামপন্থীরা পঞ্চায়েতে নির্বাচনকে ঘিরে শুধু দুর্নীতি নয়, এইভাবে মৌলিক সমস্যাগুলিকে আড়াল করে এই পরিচিতি সত্তার প্রতিক্রিয়াশীল রাজনৈতিক উদ্দেশ্যের বিরুদ্ধে সোচ্চার হচ্ছে।

সুতরাং এই অবস্থায় পঞ্চায়েত নির্বাচনকে বামপন্থীদের একটি শ্রেণি আন্দোলন ও গণ আন্দোলনভিত্তিক পঞ্চায়েতের গণতন্ত্র অভিমুখী কাঠামোটাকে পুনপ্রতিষ্ঠিত করার লড়াই শুরু করতে হবে। রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন প্রকল্প থেকে যারা বঞ্চিত হচ্ছেন এবং তাঁদের অধিকার যেভাবে দুর্বৃত্ত অধ্যুষিত দলগুলি লুণ্ঠন করছে তার বিরুদ্ধে অবিলম্বে তীব্র গণআন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। জনসাধারণের তাঁদে অধিকারগুলি সম্বন্ধে সচেতন করে দেওয়াও এই আন্দোলনের ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করতে হবে। সীমান্তবর্তী অঞ্চলে বি এস এফের অধিকার প্রসারণ এবং এন আর সি-সি এ এ লাগু করার বিষয়গুলিও পঞ্চায়েত নির্বাচনে তুলে ধরে পঞ্চায়েত স্তরে লড়াই তীব্র করতে হবে। ১০০ দিনের কাজের অধিকার সম্বন্ধে সচেতনতা বৃদ্ধি করে, কেন জব কার্ড পাচ্ছেন না এবং কাজ না পেলে বেকারভাতা কেন পাচ্ছেন না এইসব বিষয়েও তথ্য সংগ্রহ করে গ্রামসংসদ আহ্বানের দাবিতে লড়াই তীব্র করতে হবে। অর্থাৎ আগামী বছরের পঞ্চায়েত নির্বাচনকে শুধুমাত্র সংসদীয় স্তরের লড়াই হিসেবে দেখলে চলবে না। যখন ধীরে ধীরে বাস্তব অবস্থা বামপন্থীদের পক্ষে অনুকূল হয়ে উঠছে তখন এই নির্বাচনকে একটি সরকার বিরোধী, সরকারের মানুষ মারা নীতি বিরোধী লড়াই-এর ভিত্তি হিসাবে দেখতে হবে। অতীতে আমরা দেখেছি প্রতিটি পঞ্চায়েত নির্বাচনের ফলাফল পরবর্তী নির্বাচনকে কিভাবে প্রভাবিত করে। পুঁজিবাদী রাষ্ট্রব্যবস্থায় তোষণকারী দলগুলি আমাদের রাজ্যে পঞ্চায়েত ব্যবস্থার এই গুরুত্বপূর্ণ অভিমুখটা সম্বন্ধে যথেষ্ট সচেতন। ইতিমধ্যে এক বছর ধরে তৃণমূল বিভিন্ন প্রকল্পের সহায়তায় পঞ্চায়েতের ভিত্তি মেরামত করতে লেগে পড়েছে। শুধু মমতার প্রশাসনিক মিটিং নয়, জেলায় জেলায় মহিলা ও যুব কর্মীদের তাদের মতো করে সংগঠিত করার চেষ্টা করছে। বিজেপিও পিছিয়ে নেই। তাদের সঙ্গে রয়েছে প্রচার মাধ্যম। সুতরাং এই কঠিন লড়াই-এর প্রস্তুতি নিতে হবে বামপন্থীদের। সংঘ পরিবার যে সারা দেশজুড়ে বিভেদপন্থা এবং ধর্মভিত্তিক প্রচারের মাধ্যমে সর্বজনসম্মতি নির্মাণ করছে তার বিরুদ্ধে ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক সমস্ত শক্তিগুলিকে সর্বস্তরে চিন্তাচেতনার স্তরে সচেতন করে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে।

আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনে ভোট লুট রুখতে

মালদহে মহিলা কনভেনশন

মালদহ : পঞ্চায়েত ভোট লুটের চেষ্টা হলে সংগঠনের সদস্যাদের রুখে দাঁড়ানোর নির্দেশ দিলেন নিখিল বঙ্গ মহিলা সঙ্ঘের রাজ্য সম্পাদিকা কম. সর্বানী ভট্টাচার্য। রবিবার মালদহ জেলা আর এস পি কার্যালয়ে সঙ্ঘের জেলা কনভেনশনে ওই নির্দেশ দেন সর্বানী। সেখানে সর্বানী ছাড়াও বক্তব্য রাখেন সংগঠনের রাজ্য সভানেত্রী কম. সুচেতা বিশ্বাস, জেলা সম্পাদিকা কম. তৃপ্তি পাণ্ডে, আর এস পি'র জেলা সম্পাদক কম. সর্বানন্দ পাণ্ডে প্রমুখ।

প্রয়াত কম. মন্মথ বিশ্বাসের স্মরণসভা

আর এস পি পানিহাটি আঞ্চলিক সম্পাদকমণ্ডলীর প্রাক্তন সদস্য ও ২ নং ব্রাঞ্চ কমিটির প্রাক্তন সম্পাদক কম. মন্মথ বিশ্বাস গত ১০ ডিসেম্বর, ২০২২ প্রয়াত হন। আর এস পি পানিহাটি লোকাল কমিটির পক্ষ থেকে ১৮ ডিসেম্বর, ২০২২ প্রয়াত নেতার প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয় আগরপাড়ার ২ নং ও ৩ নং আজাদ হিন্দ নগরের সংযোগস্থলে। সভায় সভাপতিত্ব করেন কম. কুনাল দে এবং কম. বিশ্বাসের স্মৃতিচারণা করে বক্তব্য রাখেন কম. পঙ্কজ দাস, কম. দিলীপ দে, কম. প্রসেনজিৎ দাস, কম. শঙ্কর ভট্টাচার্য, কম. অরুনাভ লাহিড়ী, কম. অরূপ লাহিড়ী, সি পি আই এম-এর পক্ষে বক্তব্য রাখেন কম. অজিত রায়। এছাড়ও বক্তব্য রাখেন কম. মন্মথ বিশ্বাসের পুত্র কম. গোপাল বিশ্বাস।

ভাবগম্ভীর পরিবেশে অনুষ্ঠিত এই স্মরণসভায় উপস্থিত বামপন্থী কর্মী ও সদস্যদের কাছে প্রয়াত কম. মন্মথ বিশ্বাস আজীবন যেভাবে নীতিনিষ্ঠ মার্কসবাদী প্রত্যয়ে জীবনচর্যায় যুক্ত ছিল তা অনুসরণ করার কথা উল্লেখ করেন অধিকাংশ বক্তা। নেতৃবৃন্দ আরও বলেন যে, আর এস পি একটি আপসবিরোধী মার্কসবাদী লেনিনবাদী দল এবং সেই দলের সমস্ত সদস্য ও শুভানুধ্যায়ীদের বর্তমান জটিল সময়ে বিশেষ সচেতনভাবেই পুঁজিবাদ ও সাম্প্রদায়িকতাবাদের বিরুদ্ধে কঠোর সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে।

২২তম জাতীয় সম্মেলনের শিক্ষা

আর এস পি'র সর্বভারতীয় সম্মেলন সাফল্যের সঙ্গেই সমাধা হয়েছে। আশা করা অপ্রাসঙ্গিক নয় যে, এমন সফল সম্মেলনের পরবর্তীকালে দলের বিভিন্ন স্তরে সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত সমস্ত কর্মীদেরই উৎসাহিত করার বিষয়। বস্তুতপক্ষে আসাম ত্রিপুরার মতো উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির সাংগঠনিক দুর্বলতা ও দু'টি রাজ্যের রাজনৈতিক সন্ত্রাস, অস্থিরতা বা নৈরাজ্য অথবা নিরাপত্তাহীনতা থাকলেও রাজ্য সম্মেলন সংগঠিত করা সম্ভব হয়েছে। অন্যান্য বহুসংখ্যক রাজ্যেও সাংগঠনিক সম্মেলনের মাধ্যমে প্রতিনিধি নির্বাচিত করেই জাতীয় সম্মেলন সংগঠিত করা সম্ভব হয়েছে। যে সমস্ত নির্বাচিত প্রতিনিধিরা এই সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেছেন, তাঁরা অবশ্যই বর্তমান বিরূপ আর্থ রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে বিশেষ যোগ্য এবং রাজনীতিগতভাবে সচেতন বলে ধরে নেওয়া যায়। তাঁদের সারাদেশের প্রেক্ষিতে সর্বাধিক সচেতন ও উদ্যমী রাজনৈতিক কর্মী বলে আখ্যায়িত করলে অত্যুক্তি হবে না।

ধরে নেবার সঙ্গে অনুমানের সম্পর্ক অস্বীকার করা যায় না। অনুমান সর্বদাই সঠিক হবে তেমন কথা হলফ করে বলা যায় না। তবে তর্কশাস্ত্রের তাত্ত্বিক বিচারে 'অনুমান' প্রাসঙ্গিক এবং সত্যানুসন্ধানের প্রাথমিক পর্যায়ে 'অনুমান' গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সেকথা স্মরণে রেখেই বলা যায় যে চিন্তা চেতনার প্রশ্নে সমৃদ্ধ দলীয় নেতা কর্মীরাই সর্বভারতীয় সম্মেলনে মুখ্য ভূমিকায় ছিলেন। তাঁরা অর্থাৎ, সেই সমস্ত নেতা কর্মীরা নিশ্চিতই সম্মেলনের নির্যাস সঙ্গতভাবেই দলের সমস্ত স্তরে যত্নের সঙ্গে আলোচনা করবেন এবং আগামী দিনে দলের রণনীতি এবং রণকৌশল সম্পর্কে গভীরভাবে সচেতন প্রসারে সহায়ক হবেন। এমন ভাবনা কোনভাবেই অতিরিক্ত ভাবনা নয়।

দলের রণনীতি নির্ধারণে সম্মেলনে গৃহীত রাজনৈতিক দলিলটি সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। এবারের সম্মেলনে ঐক্যবদ্ধভাবেই কিছুক্ষেত্রে সংশোধনীসহ যে দলিলটি গৃহীত হয়েছে তার ব্যাপক প্রচার সবকটি রাজ্য সংগঠনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি হিসেবে বিবেচিত হওয়া উচিত। সর্বভারতীয় সম্মেলনের যথাযথ সাফল্য তখনই আমরা পেতে পারি যখন, দলের সর্বস্তরে একটি নির্দিষ্ট রাজনৈতিক বোধের প্রসার ঘটে। যে কোনও মার্কসবাদ-লেনিনবাদ অনুসারী দলের পক্ষে বাস্তব তথ্য নির্ভর রাজনৈতিক তত্ত্ব নির্মাণ সমধিক গুরুত্বপূর্ণ। সাফল্যের সঙ্গে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবার পরেই তার গুরুত্ব হারিয়ে যায় না। বরঞ্চ একসূত্রে দলের সর্বোচ্চ স্তরে গৃহীত দলিলটি অপরিসীম গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার বলে বিবেচিত হওয়াই সঠিক। দলের সর্বনিম্ন স্তরের কর্মী নেতাদেরও এই দলিলটির আলোচনা সমান গুরুত্ববাহী।

এবারের সম্মেলনে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত জাতীয় ও আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক দলিলের প্রস্তুতিকালে (২, ৩ জুলাই ২০২২) যে অবস্থান দেশে ও বিদেশে অনুধাবন করা গিয়েছিল তার ওপর ভিত্তি করেই এই দলিলটি প্রস্তুত করা হয়েছিল। ১১, ১২ ও ১৩ নভেম্বর ২০২২-এ সংগঠিত ২২তম জাতীয় সম্মেলন দীর্ঘ পাঁচমাস পরে অনুষ্ঠিত হওয়ায় বেশ কিছু নতুন নতুন বিষয় বা প্রসঙ্গ বাস্তব বিশ্লেষণের প্রশ্ন সঙ্গত কারণেই প্রতিনিধিরা উত্থাপন করেছেন। উল্লেখযোগ্য, দক্ষিণ আমেরিকার সর্ববৃহৎ দেশ ব্রাজিলের সদ্য সংগঠিত নির্বাচনে কমরেড ইনাশিও লুলার জয় বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। ওই দেশে এর আগের গণতান্ত্রিক নির্বাচনী প্রক্রিয়াকে ব্যবহার করেই জায়ের বোলসোনারোর মতো এক অতি দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়াশীল ব্যক্তি রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করে। তাঁর শাসনকালে ব্রাজিলে অবশ্যই প্রায় ফ্যাসিবাদী কায়দায় জনসাধারণের গণতান্ত্রিক দাবিগুলি দখল করার অবিরাম অপচেষ্টা চলতে থাকে।

জায়ের বোলসোনারোকে ব্রাজিলের প্রচলিত সংবিধান ও নির্বাচনী বিধি মেনে হারিয়ে দেওয়া বিশেষ শক্ত কাজ ছিল। বামপন্থীদের সম্মিলিত প্রচেষ্টা অবশ্যই ইনাশিও লুলা দ্য সিলভাকে সামনে রেখে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই চলেছে। অতি সামান্য ভোটের ব্যবধানে লুলা জয়ী হয়েছেন এবং আগামী ১ জানুয়ারি ২০২৩ তিনি অবশ্যই ব্রাজিলের রাষ্ট্রপতি হিসেবে শপথ নেবেন। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যেমন অতি দক্ষিণপন্থী ডোনাল্ড ট্রাম্প নির্বাচনে পরাস্ত হলেও তাঁর রাজনৈতিক ভাবধারা বিশেষ করে শ্বেত সন্ত্রাসী আক্রমণ পরাভূত হয়নি। এখন সারা যুক্তরাষ্ট্রে ফ্যাসিবাদী আক্রমণ চালিয়ে বহু মানুষকে হতাহত করে চলেছে ট্রাম্পের অনুগত বাহিনী। নির্বাচনের ফলাফল ট্রাম্প এখনও মেনে নেননি। জায়ের বোলসোনারোও তাঁর প্রভুসম ট্রাম্পের অনুকরণ করেই ব্রাজিলের নির্বাচনী ফলাফলকে ফুৎকারে উড়িয়ে দিয়ে বলে চলেছেন যে তিনিই রাষ্ট্রপতি।

জায়ের বোলসোনারো মার্কিন মুলুকে বিপুল সম্পদের মালিক বহুজাতিক ব্যবসায়ীদের অতি পছন্দের এক শাসক। তিনি রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচিত হবার পরেই সদর্পে ঘোষণা করেছিলেন যে, জগৎবিখ্যাত আমাজন নদীর অববাহিকার ভূখণ্ডকে তিনি খনিজ পদার্থ ব্যবসায়ীদের হাতে তুলে দেবেন। প্রয়োজনে বা তাঁর উদ্ভট প্রয়াসে কোনও বাধাবিপত্তি এলে আমাজন নদীর পার্শ্ববর্তী বিশাল অঞ্চলে সহস্রাধিক বছর ধরে বসবাস করা আদিম মানবজাতিকে নির্বিচারে হত্যা করবেন। সারা পৃথিবীর সুস্থ চিন্তা চেতনাসমৃদ্ধ মানুষদের মনে আতঙ্ক সৃষ্টি হয়েছিল। আমাজন অববাহিকার অরণ্যসম্পদ তো শুধুমাত্র ব্রাজিলেরই নয় সমগ্র বিশ্বের পরিবেশ প্রকৃতি ও বাস্তুতন্ত্রের প্রশ্নে অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি অঞ্চল। এই অঞ্চলের কোনও ক্ষতি তো পৃথিবীর আবহাওয়ায় উষ্ণায়নের ব্যাপক বৃদ্ধি করবে। এই গ্রহটির জৈব বৈচিত্র অপূরণীয় ক্ষতির মুখে পড়বে। প্রকৃতি শুধুমাত্র বিপুল মুনাফামুখী পুঁজিবাদীদের স্বার্থ রক্ষার জন্যই ব্যবহৃত হয়ে চলবে, তা কিছুতেই হতে দেওয়া যায় না।

জায়ের বোলসোনারো ২০১৮ সালের নির্বাচনে জয়লাভ করেন। সেই নির্বাচনে ইনাশিও লুলাকে প্রার্থী করা যায়নি। সর্বৈব মিথ্যা অভিযোগ তাঁকে দীর্ঘকাল কারান্তরালে অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়। যথাযথ গণতান্ত্রিক পরিবেশ নিঃসন্দেহে বিঘ্নিত হয়েছিল ২০১৮ সালের নির্বাচনকালে। লুলার বিরুদ্ধে যে অনৈতিক শাস্তির ব্যবস্থা করা হয়েছিল তা থেকে তিনি নিঃশর্তে মুক্ত হয়েই ২০২১-এর নির্বাচনে প্রার্থী হিসেবে অংশগ্রহণ করেন এবং জয়ী হন। গত মাত্র চার বছর সময়কালের মধ্যেই বোলসোনারোর অতীব উগ্র দক্ষিণপন্থী আচরণ, ফ্যাসিবাদীসুলভ হুঙ্কার এবং সাধারণ মানুষকে বিপথগামী করে নিরলস অপচেষ্টা চালিয়ে যাবার ফলে বহু মানুষের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়েছে। ভারতের মতো ব্রাজিলেরও বহু মানুষ মনে করছেন যে, বোলসোনারো এক প্রবল শক্তিশালী এবং কঠোর চিত্তের মানুষ। তাঁর কোনও বিকল্প হতে পারে না। ব্রাজিলের উন্নয়ন সম্ভব করতে হলে এমন মানুষই যথার্থ। ভারতে যেমন মোদীর বিকল্প থাকতে পারে না বলে বহুজনের বিশ্বাস!

বোলসোনারো একজন প্রাক্তন সেনা অফিসার। ব্রাজিলের বামগণতান্ত্রিক আন্দোলন দমন করতে এই দেশের সেনাবাহিনীকে একসময় ব্যবহার করা হয়। তাঁর পারিবারিক সংস্কৃতিও উচ্চশ্রেণির। গরীব মানুষদের তিনি অক্লেশে ঘৃণা করেন। তাঁর বামপন্থী মতাদর্শের প্রতি প্রবল ঘৃণা ও দ্বেষের একটি উদাহরণ জানতে পারলে মানুষটিকে সম্যক চেনা সম্ভব।

ব্রাজিলের রাষ্ট্রপতি পদে অভিষিক্ত হবার পর পরেই তিনি ইজরায়েল ভ্রমণে যান। ইজরায়েল এর রাজধানী তেল আবিব এ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমসাময়িক কালে হিটলারের ঝটিকা বাহিনীর আক্রমণে বহু লক্ষ ইহুদির মর্মান্তিক হত্যা নিপীড়ন প্রভৃতি সম্পর্কে সকলেই জানেন। 'হলোকস্ট' নামে মানব ইতিহাসের অতি কলঙ্কজনক সেসব। বোলসোনারো সেই স্মারক মিউজিয়াম দেখে বেড়িয়ে এলেন। অপেক্ষমান সাংবাদিকদের কাছে বললেন, বিশ্বমানবতার কাছে বামপন্থীরা কিংবা সমাজতন্ত্রীরাই সর্বাপেক্ষা ঘৃণ্য শত্রু। এমন উচ্চারণের কারণ কি হতে পারে? সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে বোলসোনারো সপাটে বললেন, হিটলার সমাজতন্ত্রী ছিলেন। তাঁর দলের নামে সমাজতন্ত্রী রয়েছে। এটাই প্রমাণ করে যে, সমাজতন্ত্রীরাই সর্বাপেক্ষা বড় শত্রু। এমন ইতিহাসবোধের সঙ্গে একালে একমাত্র নরেন্দ্র মোদীরই তুলনা হতে পারে!

ইনাশিও লুলা নিশ্চিতই আগামী বছরের প্রথম দিনে ব্রাজিলের ৩৯তম নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি হিসেবে শপথ নেবেন। তিনি অতীতে দক্ষতার সঙ্গে প্রশাসনিক কর্তব্য চালিয়ে গেছেন। কিন্তু বোলসোনারো বাহিনী অতি তৎপরতার সঙ্গে ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। লুলার জয়ের ব্যবধান কম হবার ফলে এইসব অতি দক্ষিণপন্থীদের সাহস আরও বেড়ে গেছে। ফলে আগামী দিনে ব্রাজিলের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষদের যথেষ্ট সচেতনভাবেই প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির আক্রমণ রুখে দিতে হবে। লুলার দল এবং তাঁর সমর্থকদের বিশেষ তৎপরতার সঙ্গেই সাধারণ মানুষের স্বার্থে লড়াই-এর মঞ্চে সামিল থাকতে হবে। পেরুতে যেভাবে পেড্রো ক্যাস্তিল্লোকে অভ্যুত্থান ঘটিয়ে ক্ষমতাচ্যুত করা হয়েছে, তেমন অপচেষ্টা ব্রাজিলেও হতে পারে। কিউবা, ভেনেজুয়েলা, বলিভিয়া, নিকারাগুয়া, চিলি সহ লাতিন আমেরিকার বহু দেশের মানুষও নিশ্চিতই লুলার প্রতি সংহতি জানাবেন।

এই সব আলোচনার নির্যাস আর এস পি'র ২২তম সম্মেলনের দলিলে যথাযথভাবে সন্নিবেশিত হতে হবে। দলের সমস্ত সাধারণ কর্মী ও নেতাদের মননে আন্তর্জাতিক স্তরে যেসব ঘটনা ঘটে চলেছে সেসবের প্রতি বিশেষ নজর রাখতেই হবে। পরিচ্ছন্ন এবং বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ বিশিষ্ট আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গি ছাড়া কোনও কম্যুনিস্ট পার্টি তাদের রণনীতি নির্মাণ করতে পারে না।

লাতিন আমেরিকা ও আফ্রিকার নানা দেশের সাধারণ মানুষ আগ্রাসী লগ্নি পুঁজির স্বার্থবাহী নয়া উদারবাদের ধারাবাহিক অনাচার অত্যাচারে বিধ্বস্ত। তাঁরা লড়াই করে চলেছে ক্ষুধা ও জীবিকার নিশ্চয়তা নিশ্চিত করতে। উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন যে, এশিয়া মহাদেশ সহ ইউরোপের বহু দেশের মানুষও যন্ত্রণাবিদ্ধ। পুঁজিবাদের অস্তিত্ব অবশ্যই নিদারুণ সংকটে এবং মরণকালে চরম অত্যাচারী ভূমিকায়। ভারতের সাধারণ মানুষ তাঁদের দৈনন্দিন জীবনের অভিজ্ঞতায় হারে হারে টের পাচ্ছেন এমন বীভৎসার।

ভারতে নরেন্দ্র মোদী সরকারের বড় সহায় আর এস এস-এর মতো একটি চরম ফ্যাসিবাদী সংগঠন। অতীতে এই কুখ্যাত সংগঠনটি আড়াল থেকে বিজেপি'র সঙ্গে সংযোগ রাখতো। ইদানীং দেখা যাচ্ছে, বিজেপি ও আর এস এস নিবিড়ভাবে প্রকাশ্যে সাধারণ জনসমাজের সামনে উপস্থিত। এত ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম ও ভাষাগত বিভাজন বিশ্বের অন্য কোনও দেশে নেই বললেই চলে। আর এস এস-এর সাংগঠনিক প্রভাব অতি দ্রুত বিস্তারলাভ করে চলেছে। অতিকায় কর্পোরেট ব্যবসায়ীরা অনেকেই তাদের মুনাফার তড়িৎগতি বৃদ্ধির জন্য আর এস এস-এর সঙ্গে বিশেষ নৈকট্য স্থাপন করছে।

এবারের সম্মেলনে গৃহীত রাজনৈতিক দলিলে এ সম্পর্কে বিশদ আলোচনা বা তথ্যমূলক বিবরণ যুক্ত করা হয়েছে। আর এস পি'র সমস্ত স্তরের কর্মী নেতাদের এ প্রসঙ্গে আরও নিবিড়ভাবে আলোচনা করতে হবে। এই রাজ্যেও বিগত প্রায় দশ এগারো বছরে আর এস এস-এর অস্বাভাবিক প্রভাব বিস্তৃত হয়েছে। উগ্র হিন্দুত্ববাদের প্রসার ঘটিয়ে এরা জনসমাজকে বিভাজিত করার অপচেষ্টায় রত। গণতান্ত্রিক আন্দোলন ব্যাহত হচ্ছে অনেকাংশে এ কারণে। এই প্রক্রিয়ার তীব্র সচেতন বিরোধিতা অবশ্য কর্তব্য।

বিলকিস বানোর ধর্ষণকারীদের অনৈতিক মুক্তি :

২ ও ৩ জুলাই যখন এই রাজনৈতিক দলিলটি প্রস্তুত করা হয়, তখন জাতীয় স্তরের অনেক ঘটনা আঁচ করা যায়নি। যেমন, গুজরাত রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করার লক্ষ্যে একদিকে যেমন নানাধরনের সামাজিক প্রযুক্তির (Social Engineering) বাস্তবায়ন করতে উদগ্রীব ছিল ঠিক তেমন উগ্রতার সঙ্গেই ওই রাজ্যে ধর্মীয় বিভেদ ও বিদ্বেষ ছড়ানোর অপকর্মও করে গেছে।

দেশ বিদেশের কোনো চিন্তাশীল মানুষ কল্পনা করতেও পারেননি যে, নরেন্দ্র মোদী অমিত শাহর দল ন্যূনতম মানবিক মূল্যবোধ বর্জিত হয়ে দেশের আইনকানুনকে পর্যন্ত উপেক্ষা করবে। সংখ্যাগরিষ্ঠতাবাদী আধিপত্যবাদ এই দলটির প্রধানতম বৈশিষ্ট্য। তার ওপর নির্ভর করেই এই দলটি চরম অপরাধ করে চলেছে দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের বিরুদ্ধে। ক্রমাগত সাম্প্রদায়িক ঘৃণা ও বিদ্বেষের প্রসার ঘটিয়ে চরম পথে চলেছে আর এস এস -বিজেপি বিষচক্র।

গুজরাতের মাটিতে ২০০২ সালে যে রাজ্যসরকারের প্রত্যক্ষ প্ররোচনায় সহস্রাধিক মানুষের রক্তস্রাবী দাঙ্গা ঘটেছিল তা এখন ইতিহাসের গর্ভে এক গভীর কলঙ্কটীকা হয়েই পরিগণিত। সেই ভয়াবহ সময়ে যেভাবে গণহত্যা সংঘটিত হয়েছিল তার বিবরণ এখনও চরম ভীতির সঞ্চার করে। ওই সময়কালে উগ্র হিন্দুত্ববাদী তস্কর বাহিনী গুজরাত জুড়ে অমানবিক তাণ্ডব চালিয়েছিল। রাজ্য সরকারের পুলিশ বাহিনীর উপস্থিতিতেই নারকীয় ঘটনাবলী ঘটে গেছে একের পর এক।

বিলকিস বানো সে সময় অন্তঃসত্তা। তাঁর তিন বছরের শিশুকন্যা এবং পরিবারের অনেককে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়। দলবদ্ধভাবে দুষ্কৃতীরা বিলকিস বানোকে ধর্ষণ করে রক্তাক্ত অবস্থায় মৃত ভেবে ফেলে দিয়েছিল। মেয়েটি কোনক্রমে বেঁচে ওঠে। তাঁর অভিযোগে দীর্ঘকাল বিচারের পর এগারোজন নরাধমের যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের সাজা ঘোষিত হয়। তারা সবাই কারাগারে থাকলেও রাজ্যের বিজেপি সরকার তাদের যথাসম্ভব সুবিধা এবং মাঝেমধ্যেই প্যারোলে ছেড়ে দেবার ব্যবস্থা করে।

অবশেষে, দিল্লির লালকেল্লার প্রাকার থেকে প্রধানমন্ত্রীর নারীসুরক্ষা সম্পর্কিত আবেগময় ঘোষণার পরেই ওই এগারোজনকে নিঃশর্তে মুক্তি দেওয়া হল। মার্কামারা দুষ্কৃতীরা তাদের যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের মেয়াদ ফুরানোর অনেক আগেই মুক্তি পেল। লজ্জার বিষয়, উগ্র হিন্দুত্ববাদী দল বিজেপি'র নেতৃকুল কারাগারের বাইরে দুষ্কৃতীদের মুক্তি উদ্‌যাপন করে ফুলের মালা পরিয়ে, মিষ্টান্ন বিতরণ করে। স্বাধীনতার অমৃতকাল মহোৎসবের কর্মসূচি চলাকালীন এক ন্যক্কারজনক পন্থায় এই কুৎসিত ঘটনা ঘটানো হল। এসবই করা হল গুজরাত নির্বাচনে হিন্দুত্ববাদের প্রতি বিশেষ আনুগত্য প্রকাশ করে। ভোটের ময়দানে আরও সুবিধা আদায়ের লক্ষ্যে। হিন্দু-মুসলমানে বিভক্ত করে সমাজ ভাবনার বিকৃতি ঘটিয়ে হিন্দু ভোট বিজেপির পক্ষে যাবে এমন ভাবনাই মুখ্য হয়ে পড়ে। সাম্প্রদায়িক সংহতির পরিবর্তে হানাহানির প্রসার ঘটানো হল।

এমনসব অতি নিন্দনীয় ঘটনা ২২তম সম্মেলনের মূল দলিলে উল্লিখিত হবার কোনো সুযোগ ছিল না। আর এস পি'র সমস্ত নেতা কর্মীদের মধ্যে এমন ন্যক্কারজনক ঘটনা সম্পর্কে গভীর আলোচনা করা অবশ্য কর্তব্য।

Vol. 70 Issue No. 21 শনিবার ২৪ ডিসেম্বর, ২০২২ আট
RN No. 2710/57 Rupees Five [By Air Rs. 6.50]
Phone : 2229-4653; e-mail : kranti.press@yahoo.com

পেরুতে রেজিম চেঞ্জ

অ্যান্ডিয়ান পর্বতমালা সংলগ্ন পেরু অশান্ত হয়ে উঠেছে। গত বছরের ১৮ জুলাই এই লাতিন আমেরিকার নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি হিসেবে শপথ নিয়েছিলেন পেদ্রো কাস্তিল্লো টেরোনেস। মাত্র দেড় বছরের মতো এই বামপন্থী জননেতার শাসনকালে পেরুর কায়েমী স্বার্থ নানাভাবে অনভিজ্ঞ এই ৫৩ বছরের রাষ্ট্রপতিকে বারংবার বিড়ম্বনায় ফেলেছে। যে কোনও প্রগতিশীল পরিবর্তনে উদ্যোগী হলেই দুস্তর বাধার প্রাচীর তুলেছে। কাস্তিল্লো সরাসরি রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হলেও তাঁর দেশের সংবিধান অনুযায়ী জাতীয় সংসদে তাঁর প্রয়োজনীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল না বললেই চলে।

বহু প্রাচীন সভ্যতার দেশ পেরু। ইন্কা সভ্যতার নিদর্শন বহন করছে পেরুর মাচু পিচু। প্রায় হাজার বছরের পুরনো এই নিদর্শনগুলি বিশ্বের বহু মানুষকেই আকৃষ্ট করে। মাচুপিচুর নগরসভ্যতা অন্ডেস্ পর্বতমালার ওপরে গড়ে উঠেছিল। প্রত্নতাত্ত্বিকরা বলেন যে, ১৫ শতকের শেষদিকে এই শহর পরিত্যক্ত হয়। ক্রমে তা ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়ে নিজের অস্তিত্ব ইতিহাসের পাতায় বাঁচিয়ে রাখে। শোনা যায়, ইন্কা অ্যাজটেক, মায়া প্রভৃতি সভ্যতা বেশ উন্নতই ছিল। ইউরোপীয় মার্কেন্টাইল পুঁজির অতি হিংস্র দুনিয়া দখলদারি বহু প্রাচীন সভ্যতাকে নির্বিচারে ধ্বংস করেছে। ফায়ার পাওয়ার বা উন্নত অস্ত্রসম্ভারসহ নিঃশেষে গণহত্যা সংগঠিত হয়েছে দীর্ঘকাল জুড়ে।

পেরুর ইতিহাস অনেকটা এমন প্রক্রিয়াতেই কলঙ্কলিপ্ত। বিভিন্ন দেশের জনজাতিগুলি আত্মসমর্পণে বাধ্য হয়েছে। প্রাণের দায় বড় কঠোর এবং বিয়োগব্যাথায় দীর্ণ। পরিবর্ত আধিপত্যবাদী শাসনপ্রণালীও ক্রমে জাঁকিয়ে বসেছে। এইসব দেশগুলিতে শাসনক্ষমতা মুখ্যত স্পেনীয় বা পর্তুগীজ হার্মাদ বাহিনীর কব্জায় চলে গেছে। আদিম মানুষদের পক্ষে সেসব প্রতিরোধ করে নিজেদের অস্তিত্ব বহাল রাখা অসম্ভব হয়ে পড়েছিল। সম্ভবত সেইসব কারণেই পেরুর মতো অনেক দেশের সাধারণ মানুষের মনন পর্যন্ত প্রতিক্রিয়াশীল দক্ষিণপন্থী অত্যাচারীদের মতলবের কাছে পর্যুদস্ত হয়ে পড়েছে। পেরুর মতো দেশে দীর্ঘসময়ব্যাপী দক্ষিণপন্থী শাসকদের পরিবর্ত গড়ে ওঠেনি।

বিগত শতাব্দীর সত্তরের দশকে পেরুর পার্শ্ববর্তী চিলিতে বামপন্থী সমাজতন্ত্রী মতাদর্শের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ডাক্তার সালভাদর আয়েন্দে গোসেইন ওই দেশের সংবিধান নির্ধারিত পদ্ধতিতে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বৃহদাকার বহুজাতিক ব্যবসায়ীদের চরম অপছন্দের ছিলেন ডা. আয়েন্দে। তাঁর রাষ্ট্রপতিত্ব অতি স্বল্পকাল পরেই হিংস্র সামরিক অভ্যুত্থানের শিকার হয়েছিল। সামরিক কর্তা অগুস্ত পিনোশের ফ্যাসিবাদী অপশাসনের প্রবর্তন এবং জনপ্রিয় রাষ্ট্রপতি আয়েন্দে চিলির রাজধানী সান্তিয়াগোর রাষ্ট্রপতি প্রাসাদের মধ্যেই নিহত। জগৎবিখ্যাত কবি ও কম্যুনিস্ট ভাবধারার বাহক পাবলো নেরুদাকেও প্রকারান্তরে হত্যাই করা হয়েছিল। উদ্দেশ্য তথাকথিত শিকাগো স্কুলের অর্থনীতিবিদদের অন্যতম ফ্রেইড মিলটনের নেতৃত্বে নয়া উদারবাদী ভাবধারার সফল প্রয়োগ। বাস্তবে, স্বৈরশাসন ছাড়া এমন জনবিরোধী প্রকল্প বাস্তবায়িত হতে পারে না।

চিলির মানুষের প্রতিবাদী আন্দোলনগুলি সামরিক বাহিনীর গোলা বারুদের নির্বিচার ব্যবহারে পর্যুদস্ত হয়েছিল। পিনোশের অপশাসন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একান্ত সমর্থন বা দালাল হিসেবে দীর্ঘস্থায়ী হয়েছিল। চিলির সাধারণ মানুষের এমন দুর্দশায় পেরুর মানুষদের মানুষদের কোনও বিশেষভাবে প্রভাবিত করেনি। ওদেশে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির আধিপত্য সজাগ ছিল।

পেরুর সাধারণ মানুষ শত যন্ত্রণাতেও দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির অপশাসন ও আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে তেমন উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করতে পারেন নি। অবশ্যই ভিতরে ভিতরে মানুষের ধূমায়িত ক্ষোভ দেশের রাজধানী লিমার রাজপথে অনেকবার আছড়ে পড়েছে। কিন্তু সেভাবে প্রতিরোধের শক্ত প্রাচীর গড়ে ওঠেনি। দীর্ঘকাল প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলি মার্কিন দেশের বদান্যতায় শাসনক্ষমতায় স্থিত ছিল। এই প্রথম এক বিদ্যালয় শিক্ষক ও অক্লান্ত বামপন্থী কর্মী পেদ্রো কাস্তিল্লো রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে বিপুল ভোটে জয়ী হয়ে দেশের শীর্ষ শাসনক্ষমতায় স্থিত হতে পেরেছিলেন।

রাজধানী লিমা থেকে অনেকটা দূরে গ্রামীণ এলাকায় তাঁর মনোগঠন। শিক্ষক আন্দোলনের প্রথম সারির নেতা হয়ে উঠেছিলেন প্রশাসনিক বিষয়ে কিছুটা অনভিজ্ঞ মধ্য পঞ্চাশের এই বামপন্থী নেতা। প্রশাসন পরিচালনায় তাঁর কোনও পূর্ব অভিজ্ঞতাই ছিল না।

রাষ্ট্রপতি পদে অভিষিক্ত হবার পর থেকেই কাস্তিল্লো দ্রুততার সঙ্গে সাধারণ মানুষের স্বার্থবাহী পদক্ষেপ নিতে শুরু করেন। কায়েমী স্বার্থবাদীদের কাছে কাস্তিল্লো অতিদ্রুত ভীতির কারণ হয়ে ওঠেন। সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠতা না থাকার বিষয়টি কাস্তিল্লোর বিরোধিতার ক্ষেত্রে বিশেষ সুবিধা করে দেয়। সংসদে কাস্তিল্লোকে বারংবারই ইমপিচ করার ধারাবাহিক অপচেষ্টা চলে।

কাস্তিল্লোর সমস্ত পরিকল্পনা এবং সাধারণ মানুষের স্বার্থবাহী কর্মসূচিগুলির বাস্তবায়ন অসম্ভব হয়ে ওঠে। ২০২২-এর অক্টোবর মাস থেকেই কাস্তিল্লো পেরুর বর্তমান সংসদ ভঙ্গ করে নতুন নির্বাচনের দিকে যাবার ঘোষণা করেন। সেই পথেই তিনি অগ্রসর হবার চেষ্টা করছিলেন। সম্ভবত এছাড়া অন্য কোনভাবে রাষ্ট্রপতি পদে টিঁকে থাকার কোনও যুক্তিই কাস্তিল্লোর কাছে ছিল না। ক্রমাগত সংঘাত ও নতুন নতুন ষড়যন্ত্রে বিদ্ধ হতে থাকেন কাস্তিল্লো।

অবশেষে পেরুর দক্ষিণপন্থী কায়েমী স্বার্থবাদী শক্তির উদ্যোগে দেশের সেনাবাহিনী এবং পুলিশের যৌথ আক্রমণে গত ৭ ডিসেম্বর ২০২২ এক অভ্যুত্থান। কাস্তিল্লোকে বন্দি করে কারান্তরালে তাঁর স্থান করে দেওয়া হয়। পেদ্রো কাস্তিল্লোর সঙ্গেই নির্বাচিত উপরাষ্ট্রপতি দিনা বলুয়ার্তেকে রাষ্ট্রপতি পদে বসিয়ে এবং সেনাবাহিনীর সহায়তায় পেরুর বামপন্থী আন্দোলনের সাময়িক বিজয় স্তব্ধ করে দেওয়ার অপচেষ্টা শুরু হয়ে যায়।

লাতিন আমেরিকার নানা দেশে প্রচলিত সংসদীয় গণতান্ত্রিক পথেই বেশ কিছু ইতিবাচক পরিবর্তন সম্ভব হয়েছে। কিন্তু একই সঙ্গে বহু ধরনের আক্রমণাত্মক ষড়যন্ত্রের বিকাশও ঘটেছে। বহু দেশে বারবার স্বৈরশাসন বিশেষ করে, সামরিক বাহিনীর নিষ্ঠুর শাসনে জনজীবন ত্রস্ত হয়েছে। বহু মানুষের মৃত্যু ঘটেছে। পেরুর বর্তমান অভিজ্ঞতাও চিলি, বলিভিয়া এমন কি ব্রাজিল প্রভৃতি দেশের পূর্ণ অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিলিয়ে দেখা যেতে পারে।

সংসদীয় গণতন্ত্রের চরম সীমাবদ্ধতা বা দুর্বলতা প্রকট হয়ে পড়েছে এই দেশটিতে। সংশয়, পেদ্রো কাস্তিল্লোকেও হয়তো দীর্ঘকাল কারান্তরালে অবরুদ্ধ থাকতে হবে অথবা তাঁকে হত্যা করার চক্রান্তও থাকতে পারে। পেরুর ইতিহাসে প্রথম বামপন্থীদের দীর্ঘস্থায়ী বিজয় হয়তো আরও সময়, ধৈর্য এবং সাহসের ওপর নির্ভর করেই আগামীদিনে সম্ভব হবে। শুধুমাত্র প্রচলিত সংসদীয় গণতান্ত্রিক পথ অনুসরণ করেই সমাজতান্ত্রিক বা নিদেনপক্ষে সাধারণ মানুষের ব্যাপক স্বার্থ রক্ষা করার কাজ কতটা সম্ভব হবে তা গভীরভাবে চিন্তা করতেই হবে। লগ্নিপুঁজির অতি মুনাফা আদায়ের পথে সামান্যতম বাধা সৃষ্টি হলেই গণতান্ত্রিক পথে নির্বাচিত সরকারের পতন ঘটবে। রেজিম চেঞ্জ হয়ে চলবে। লাতিন আমেরিকার নানা দেশের সাংবাদিকরা জানাচ্ছেন যে, পেরুর হাজার হাজার সাধারণ মানুষ রাজধানী লিমার রাজপথে বিক্ষোভে সামিল। তাঁরা অভিযোগ তুলছেন যে, দেশের নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি পেদ্রো কাস্তিল্লোকে অপহরণ করে কারাগারের গোপন অন্ধকারে বন্দি রাখা চলবে না। অবিলম্বে মুক্তি দিতে হবে এই জননেতাকে। নতুন করে সাধারণ নির্বাচনের ব্যবস্থা করতে হবে। মানুষ সহজেই এমন চক্রান্তমূলক কর্মকাণ্ড মেনে নিতে প্রস্তুত নন। আগামীদিনের অপেক্ষায় আমাদের থাকতেই হবে।

জয়েন্ট কাউন্সিল অফ্ হেলথ্

১৪তম জেলা সম্মেলন দঃ দিনাজপুর

বালুরঘাট জয়েন্ট কাউন্সিল ভবনে অনুষ্ঠিত হলো জয়েন্ট কাউন্সিল অফ্ হেলথ্-এর ১৪তম জেলা সম্মেলন। ২০ নভেম্বর ২০২২ রবিবার সকাল ১১টায় শুরু হয় জেলা সম্মেলন। প্রতি ব্লক থেকে সদস্য-সদস্যারা জেলা সম্মেলনে উপস্থিত হয়েছিলেন। সম্মেলনে উদ্বোধনী বক্তব্য রাখেন জয়েন্ট কাউন্সিল জেলা সম্পাদক কম. জয়ন্ত চক্রবর্ত্তী। তিনি রাজ্য সরকারের শিক্ষানীতির তীব্র সমালোচনা এবং রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের বঞ্চনার প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করেন। এরপর কম. বিশ্বনাথ চৌধুরী, (প্রাক্তন মন্ত্রী পঃ বঃ সরকার) বলেন, রাজ্য সরকারের শিক্ষানীতি এবং শিক্ষক নিয়োগের সমালোচনা করেন। কোভিড পরিস্থিতির সময় স্বাস্থ্যদপ্তরের কর্মীদের কাজের প্রশংসা করেন। পাশাপাশি বলেন স্বাস্থ্য দপ্তরের কর্মীরা আন্দোলনের মধ্যে আছেন।

ওইদিন সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৫টা অবধি প্রতিনিধি সম্মেলন চলে। কম. স্বপন দাশগুপ্ত সম্পাদকীয় প্রতিবেদন পাঠ করেন। সম্পাদকীয় প্রতিবেদন নিয়ে ক্যাডার ভিত্তিক সদস্যবৃন্দ আলোচনা করেন। সম্মেলনের আয় ও ব্যয় সম্বলিত হিসাব পাঠ করেন কম. পঙ্কজ সরকার, কোষাধ্যক্ষ, জয়েন্ট কাউন্সিল হেলথ্। সম্পাদকীয় প্রতিবেদনের উপরে বক্তব্য রাখেন কম. শিবানী চক্রবর্তী, জেলা সম্পাদিকা, নার্সিং ক্যাডার অ্যাসোসিয়েশন। মেডিকোর পক্ষে আলোচনা করেন মেডিকো সদস্য কম. বিমলচন্দ্র দাস। আশা কর্মীদের পক্ষে আলোচনা করেন কম. দিপালী রায়। সারা বাংলা চুক্তিভিত্তিক কর্মচারীদের পক্ষে আলোচনা করেন কম. গৌরচন্দ্র পাল, জেলা সদস্য এবং কম. অনিমা মাহাত। এন এম টি পি এ-এর পক্ষে আলোচনা করেন কম. পঙ্কজ সরকার। জেলা সম্পাদক, এন এম টি পি এ।

কম. স্বপন দাশগুপ্ত জবাবী ভাষণে বলেন, পশ্চিমবঙ্গ সরকার ট্রেজারি থেকে বেতনভুক্ত কর্মচারীর সংখ্যা হ্রাস করছে, পাশাপাশি চুক্তিভিত্তিক কর্মচারীর সংখ্যা বৃদ্ধি করছে। চুক্তিভিত্তিক কর্মচারীদের সামাজিক সুরক্ষা থেকে পশ্চিমবঙ্গ সরকার বঞ্চিত করছে। সম্মেলন মঞ্চ থেকে তার প্রস্তাব আগামী দিনে চুক্তিভিত্তিক কর্মচারী এবং ন্যাশনাল হেলথ্ মিশনের কর্মচারীদের নিয়ে সংগঠন এবং আন্দোলন সংগঠিত করার আহ্বান জানান। আগামী ৩ বছরের জন্য ২৪ জন সদস্যকে নিয়ে একটি শক্তিশালী জেলা কমিটি গঠন করা হয়। কম. জয়ন্ত চক্রবর্তী সভাপতি, কম. স্বপন দাশগুপ্ত জেলা সম্পাদক ও কম. পঙ্কজ সরকার জেলা কোষাধ্যক্ষশ্র নির্বাচিত হয়েছেন।

২০ ডিসেম্বর ভিয়েতনাম মুক্তিযুদ্ধের এক স্মরণীয় দিন

দীর্ঘ ৬২ বছর অতিক্রান্ত হল। আবার এসেছে ২০ ডিসেম্বর। ১৯৬০ সালের ২০ ডিসেম্বর পরাধীন ভিয়েতনামে স্বাধীনতা যুদ্ধ পরিচালনার লক্ষ্যে জাতীয় মুক্তি মোর্চা বা ন্যাশনাল লিবারেশন ফ্রন্ট গঠিত হয়। আগ্রাসী যুদ্ধবাজ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে মরণপণ সংগ্রামে অবতীর্ণ হয় এই ফ্রন্ট। মার্কিন কর্তাদের প্রত্যক্ষ প্ররোচনায় দক্ষিণ ভিয়েতনামে যে পুতুল সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তার বিরুদ্ধেও লাগাতার সংগ্রাম চলেছে।

ভিয়েতনামের মুক্তিসংগ্রাম চলেছিল দীর্ঘ ১৫ বছর। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন সাম্যবাদী নেতা হো চি মিন ছিলেন এই ঐতিহাসিক সংগ্রামের পুরোভাগে। কত মানুষের রক্তপিচ্ছিল পথে ভিয়েতনামের স্বাধীনতা সম্ভব হয়েছিল তার কোনো সঠিক হিসেব করে ওঠা অসম্ভব। নৃশংস সাম্রাজ্যবাদী অপশক্তি এবং তাদের ক্রীড়নক দক্ষিণ ভিয়েতনামের পুতুল সরকার নির্বিচারে গণহত্যা করে ভিয়েতনামবাসীদের অবদমিত করার কুকর্ম চালিয়ে গেছে।

ভারতের নানা অংশে বিশেষ করে বামপন্থী গণতান্ত্রিক আন্দোলনের অন্যতম কেন্দ্র পশ্চিমবঙ্গের ছাত্র-যুব ও সাধারণ শ্রমজীবী মানুষ সক্রিয় সহমর্মিতা জানিয়েছিলেন ভিয়েতনামের মুক্তিযুদ্ধে। হাজার হাজার ছাত্র-যুব রক্তদান করে বহু পরিমাণ প্লাজমা পাঠিয়েছিলেন ভিয়েতনামে যুদ্ধরত গেরিলা বাহিনীর জন্য। তা এক স্মরণীয় উজ্জ্বল ইতিহাস।

আগ্রাসী মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী শক্তির হানাদার বাহিনী অবশেষে বিধ্বস্ত হয়ে পড়ে। দীর্ঘ ১৫ বছর যুদ্ধের পর ১৯৭৫ সালের ৩০ এপ্রিল উত্তর ও দক্ষিণ ভিয়েতনাম একত্রিত হয়ে কমরেড হো-চি মিন-এর নেতৃত্বে সমাজতান্ত্রিক গণরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এখনও ২০ ডিসেম্বর সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনে একটি স্মরণীয় উজ্জ্বল দিন হিসেবে প্রতিপালিত হয়।

Printed and published by Manoj Bhattacharya from Kranti Press, 37 Ripon Street, Kolkata-700 016, Editor : Manoj Bhattacharya of behalf of RSP (Website : www.ganavarta.com)
Price Rs. 5/-